بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার

১. প্রশ্নঃ আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি সায়মা কাদরী এবং আমার প্রশ্ন, ইসলাম ধর্মে কোন নারী নবী আসেনি কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন প্রশ্ন করেছেন, ইসলাম ধর্মে কেন নারী নবী আসেনি? যদি নবী বলতে আপনি এমন এক ব্যক্তি বোঝান যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বাণীপ্রাপ্ত হন এবং যিনি মানব জাতির নেতা হিসেবে কাজ করেন। সেই অর্থে এটা নিশ্চিত যে, ইসলামে আমরা কোন নারী নবী পাইনি। এবং আমি মনে করি এটি যথার্থ, কারণ যদি নারীকে নবী হতে হয় তবে সে সমাজের প্রধান হতে হবে কিন্তু কুরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে পুরুষ হলো পরিবার প্রধান। সুতরাং যদি পুরুষ পরিবারের প্রধান হয় তবে কিভাবে নারী সমগ্র সমাজের নেতৃত্ব দিবে? দ্বিতীয়ত– একজন নবীকে নামাজের জামায়াতে ইমামতি করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে নামাজের বেশ কিছু শারীরিক কসরত রয়েছে যেমন- কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি। যদি একজন নারী নবী নামাজে নেতৃত্ব দিত তবে জামায়াতের পিছনে যে সকল পুরুষ নামাজ পড়ে এবং ইমাম উভয়ের পক্ষে এটি বেশ বিব্রতকর।

আরো কিছু ব্যাপার রয়েছে। যেমন একজন নবীকে সর্বক্ষণ সকল সাধারণ মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে হয়, একজন মহিলা নবীর পক্ষে যেটা অসম্ভব। কারণ ইসলাম নারী পুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

যদি মহিলা নবী হতো এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যখন গর্ভবতী হতো, তখন তার পক্ষে কয়েক মাস নবুওয়াতের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা কোনভাবেই সম্ভব হতো না। এবং সন্তান জন্মের পর তার পক্ষে একই সাথে সন্তান পালন করা এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করা কখনোই সম্ভব হবে না।

কিন্তু একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে একই সাথে পিতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার মাতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলকভাবে অনেকগুণ সহজ।

কিন্তু নবী বলতে যদি, এমন একজন ব্যক্তি বোঝান হয় যিনি আল্লাহর পছন্দের এবং যিনি পবিত্র ও খাঁটি ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছু নারী রয়েছেন আমি এখানে উত্তম ও উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করব বিবি মরিয়মের (রা) নাম। এটি সূরা মরিয়মে উল্লেখ রয়েছে।

সূরা আলে ইমরানের ৪২ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَٰلَمِينَ ـ

"যখন ফেরেশতা মারইয়ামকে বললেন, "যে আল্লাহ আপনাকে নির্বাচিত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বজগতের নারীদের উপর নির্বাচিত করেছেন।" -সূরা আলে-ইমরানঃ ৪২

এখন আপনি যদি মনে করেন নবী হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি মনোনীত এবং পরিশুদ্ধও পবিত্র, তবে আমরা বিবি মারইয়ামকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যিনি ছিলেন ঈশা (আ)-এর মাতা যাকে অন্যরা যিশু বলেন। কুরআনে এমন নারীদের সম্পর্কে আরো উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ـ

"আল্লাহ ইমানদারদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রী (আছিয়া)-এর অবস্থা বর্ণনা করছেন"। - আল কুরআন তাহরীমঃ ১১

তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন–

اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্ধারণ করে দিন আর আমাকে ফেরাউন এবং তার (কুফুরী) আচরণ থেকে হেফাযত করুন, আর সমস্ত অত্যাচারী লোকজন থেকেও হেফাজত করুন।" -সূরা তাহরীম ঃ ১১

চিন্তা করুন, আছিয়া ছিলেন তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাট ফেরাউনের স্ত্রী এবং তিনি আল্লাহর ভালবাসার জন্য স্বীয় সব আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করতে চেয়েছেন।

উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চারজন মহিলা নবী এসেছেন তারা হলেন, বিবি মারইয়াম (রা), বিবি আছিয়া (রা), বিবি ফাতেমা (রা) ও বিবি খাদিজা (রাঃ)। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

২. প্রশ্নঃ আমি সামির, আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন হল, ইসলামে একজন পুরুষকে সর্বোচ্চ চারটি বিয়ের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেন ১১ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন– এজন্য কী তাকে উচ্চ যৌনআকাঙ্খী বলে কটাক্ষ করার সুযোগ থাকে না?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার সাথে আমি একমত যে, পবিত্র কুরআন কারীমের সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে সর্বাধিক ৪ জন স্ত্রী রাখার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু কুরআনের অন্য আয়াতে সূরা আহযাবে রয়েছে যে–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ـ

"হে নবী এরা ভিন্ন অন্য কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার জন্য এটাও হালাল নয় যে, আপনি (বর্তমান) স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন (অবশ্য) পরিবর্তন ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বা ইহাদের কাউকে তালাক দেয়া না-জায়েয নয়। যদিও এদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে ঐ সব মহিলা ছাড়া যারা আপনার মালিকানাধীন।" -সূরা আহযাবঃ ৫২

এই আয়াত রাসূল (সাঃ)-কে তার সমস্ত স্ত্রীগণকে রাখতে এবং একই সাথে তাকে নতুন অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করতে অনুমতি দিয়েছে, তবে তার অধিকারভুক্ত মহিলাগণ বাদ দিয়ে।

এখন যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কেন মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অন্য কাউকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি এবং কেন তার বর্তমান স্ত্রীদের তালাকের কথা বলা হয়নি– এর ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে– নবীর স্ত্রীগণকে হয় তারা তালাক প্রাপ্ত নয় বিধবা; কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না। কেননা তারা "উম্মুল মুমেনিন।" বা সকল মুসলমানদের মা।

সুতরাং কেউ তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না আর স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে নবী (সাঃ) তাদেরকে তালাক দিবেন না। নবী (সাঃ)-এর ১১টি বিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো রাজনৈতিক কারণে নয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে এবং এগুলো তার যৌনাকাঙ্খা পূরণের জন্য নয়।

তিনি প্রথম হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তখন খাদিজা (রা) ছিলেন ৪০ বছর বয়স্কা এবং নবী (সাঃ) এর বয়স ছিল ২৫ বছর।

উপরন্তু তিনি ছিলেন দু'বারের বিধবা। এখন চিন্তা করুন তিনি যদি যৌন আকাঙ্খা পূরণের জন্য বিয়ে করতেন, তবে কেন তিনি পনের বছর বেশি বয়সের মহিলা বিয়ে করবেন যিনি ছিলেন দুই বারের বিধবা।

লক্ষণীয় বিষয় যে যতদিন হযরত খাদীজা (রাঃ) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি কাউকে বিয়ে করেননি। যখন বিবি খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করেন তখন মুহাম্মদ (সা)-এর বয়স ৫০ বছর। কেবলমাত্র ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। চিন্তা করুন, তিনি যদি অতিমাত্রায় কামাসক্ত হতেন তবে কী তিনি তরুণ বয়সে অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ না করে ৫৩/৫৬ বয়সে বিয়ে করতেন?

বিজ্ঞান বলে "বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যৌন ক্ষমতাও হ্রাস পায়"। সুতরাং এটি নির্দিধায় বলা যায় অধিক কামাসক্ত বলাটা নবীর প্রতি এক ধরনের কটূক্তি বৈ কিছুই নয়।

নবী (সা)-এর দুটি বিবাহ ছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আর তা হল– বিবি খাদিজা (রা) ও বিবি আয়েশা (রা)-এর সাথে বিবাহ। আর বাকী বিবাহগুলো ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে নয়তো রাজনৈতিক কারণে। আরো লক্ষণীয় যে, তার স্ত্রীগণের মধ্যে কেবলমাত্র দুই জনের বয়স ছিল ৩৬ এর কম। বাকী সকলের বয়স ছিল ৩৬ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

আমরা এখন প্রত্যেকটি বিয়ের কারণ উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

প্রথমেই বিবি যোহায়ারিয়া সম্পর্কে আসা যাক। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের, যে গোত্র তৎকালীন আরবে বেশ শক্তিশালী গোত্র হিসেবে বিবেচিত হত। এ গোত্রের সাথে মদীনার তথা ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুতা ছিল, এক যুদ্ধে তারা ইসলামী বাহিনীর কাছে পদানত হয় তার পরে হযরত মুহাম্মদ (সা) তাকে বিয়ে করেন। তিনি বিবি যোহায়রিয়াকে বিয়ে করার পর সাহাবীরা বললেন, আমরা কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আত্মীয়দের বন্দী রাখতে পারি? তারপর সাহাবীরা তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন এবং এতে তৎক্ষণাৎ দুই গোত্র বন্ধু হয়ে গেল।

বিবি মাইমুনা (রাঃ) এর কথায় আসা যাক। তিনি ছিলেন বনী নাজাদ গোত্র প্রধানের স্ত্রীর বোন, যে ৭০ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে যাদেরকে রাসূল (সা)-ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (সা) মাইমুনা (রা) কে বিয়ে করার ফলে বনু নাজাফ গোত্র মদিনার নেতৃত্বকে মেনে নিল এবং মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল।

একইভাবে তিনি উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করেন, যিনি ছিলেন মক্কার প্রধান কর্তা ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের মেয়ে। কিন্তু এই বিয়ে মক্কা বিজয়ে বিশাল অবদান রাখে।

বিবি সাফিয়া (রা) ছিলেন প্রভাবশালী ইহুদী নেতার মেয়ে। কিন্তু নবী (সা)-তাকে বিয়ে করায় তিনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক স্থাপন করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হযরত ওমরের কন্যা হাফসা (রা) কে বিয়ে করেছিলেন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে। তিনি সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে তাঁর চাচাতো বোন জয়নবকে (রা) বিয়ে করেন। যিনি ছিলেন তালাকপ্রাপ্ত।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তাঁর প্রত্যেকটি বিয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে হয় সামাজিক সংস্কার হয়তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা প্রতীয়মান যে, তার প্রত্যেকটি বিয়ের ভিত্তি ছিল সমাজের মানুষের মধ্যে তথা গোত্রে গোত্রে ভাল সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষে– যৌনাকাঙ্খা পূরণের জন্য নয়।

৩. প্রশ্নঃ আমি হাসিনা ফারয়াজী, আইনের ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হল– বহু বিবাহ মহিলাদের জন্য কোন দিক থেকে উপকারী?

ডা. জাকির নায়েক ঃ জবাবে বলতে চাই, যদি একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীকে বিয়ে করে, তবে এটি মহিলাদের এভাবে উপকার করে যে, এটি মহিলাদের সংযত রাখতে সাহায্য করে; কারণ যেহেতু পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি তাই যদি প্রত্যেক পুরুষ একটি মহিলা বিয়ে করে তবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা স্বামী খুঁজে পাবে না। তখন তাদের সামনে একটাই পথ খোলা, তারা 'জন সম্পত্তি' হয়ে যাবে। তাই ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে– তাদের সংযত রাখার জন্য, তাদের জনসম্পত্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

৪. প্রশ্নঃ আমি মোঃ আশরাফ। আমার প্রশ্ন, ইসলামে দত্তক নেয়া কী বৈধ?

ডা. জাকির নায়েক ঃ যদি দত্তক নেয়া বলতে এ কথা বুঝায় যে, কেউ একজন বাচ্চা ছেলে গ্রহণ করেছে, যে কিনা গরীব শিশু এবং তাকে গৃহে থাকা, খাওয়া ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছে; সেক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছে। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে তোমরা গরীব ও অভাবী মানুষদের সাহায্য কর।

আপনি এমনকি একটি শিশুকে আপনার পিতার স্নেহ দিয়ে নিজের ঘরে পালন করতে পারবেন এতে কোন বাধা নেই। কিন্তু ইসলামে এক্ষেত্রে বাধা হলো আপনি আইনগতভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না। তার নামের সাথে আপনার নাম জুড়ে দিতে পারবেন না। আইনগত দত্তক নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। এর কারণ, যদি কেউ এরকম দত্তক নেয় তবে সেখানে বেশ কিছু জটিলতা দেখা দেয়। প্রথম, শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে সে তার পরিচিতি হারাবে। দ্বিতীয়ত, দত্তক নেওয়ার পর আপনার নিজেরও সন্তান হতে পারে। তখন আপনি দত্তক শিশুর চেয়ে নিজের সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারেন। তৃতীয়ত, যদি আপনার সন্তান জন্ম নেয় এবং দত্তক শিশুও আপনার নিজের শিশুর বিপরীত লিঙ্গের হয়, তখন তারা একই বাসায় খোলাখোলিভাবে থাকতে পারবে না, কারণ তারা রক্ত সম্পর্কের ভাই বোন নয়।

যদি দত্তক শিশু মেয়ে হয় এবং সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার বাবার তথা আপনার সাথে পর্দা করতে হবে, কারণ সে রক্ত সম্পর্কের কন্যা নয়।

দত্তক শিশুটি ছেলে হলে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে তার কথিত মায়ের পর্দা রক্ষা করতে হবে; এবং সে ছেলে যদি বড় হয়ে বিয়ে করে তবে তার স্ত্রী ও তার কথিত পিতার মাঝে অবশ্যই পর্দা থাকতে হবে।

তাছাড়া আরো অনেকগুলো কারণ আছে – যদি আপনি দত্তক নেন, তবে আপনি আপনার আত্মীয়দের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করলেন।

যদি কারো পিতা মারা যায় তবে তার সমুদয় সম্পত্তি, কুরআন বর্ণিত নিয়মানুসারে তাদের মাঝে বন্টন করতে হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর দেখা যায় তার নিজের সন্তান এবং দত্তক সন্তানও থাকে, সেক্ষেত্রে তার সন্তানগণ সম্পত্তির অংশ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী, তার মা রেখে মারা যায় যার কোন সন্তান নেই, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি তার সন্তান থাকে তবে স্ত্রী পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি তার সন্তান না থাকে তবে স্ত্রী এক তৃতীয়াংশ পাবে।

কিন্তু যদি তার দত্তক সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার প্রাপ্ত ভাগ থেকে একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং এই ধরনের জটিলতার কারণেই ইসলাম আইনগত সন্তান দত্তক নেয়া নিষিদ্ধ করেছে।

৫. প্রশ্নঃ আমি সাবা, আমি একজন ছাত্রী। আমার প্রশ্ন, পুরুষরা জান্নাতে গেলে সুন্দরী কুমারীদেরকে 'হুর' হিসেবে পাবে। তাহলে মেয়েরা জান্নাতে গেলে কী পাবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে চার জায়গায় 'হুর' এর উল্লেখ রয়েছে। সূরা দুখানের ৫৪নং আয়াত, সূরা তূর এর ২০ নং আয়াত, সূরা আর রাহমানের ৭২ নং আয়াত এবং সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে হুর-এর কথা এসেছে। অধিকাংশ অনুবাদগুলোতে বিশেষ করে উর্দু ভাষায় 'হুর'-কে সুন্দরী কুমারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি 'হুর' এর অর্থ সুন্দরী কুমারী হয়, তাহলে মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? প্রকৃতপক্ষে, 'হুর' শব্দটি 'আহওয়ার' এবং 'হাওয়ার' এ দুটি শব্দের বহুবচন থেকে এসেছে। 'আহওয়ার' পুরুষের ক্ষেত্রে এবং 'হাওয়ার' মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর 'হুর' শব্দটি বৈশিষ্ট্য বহন করে "হাওয়ার" এর যা দ্বারা বোঝায় বড়, সাদা, সুন্দর চোখ এবং বিশেষত এর দ্বারা চোখের সাদা রং কে বোঝায়।

আল কুরআনের কয়েক জায়গায় 'আয্ওয়াযুম মুতাহহারাতুন' বলে একই কথা বোঝানো হয়েছে। সূরা বাকারার ২৫নং আয়াতে এবং সূরা নিসার ৫৭নং আয়াতে বলা হয়েছে- أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ "আয্ওয়াজুম মুতাহ্হারা", অর্থ হল সঙ্গী বা সাথী। মুহাম্মদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন 'Spouse' বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এর অনুবাদ করেছেন 'Companion' বা সঙ্গী হিসেবে।

সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হল, সঙ্গী বা সাথী। পুরুষরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী নারী আর নারী পাবে বড় সুন্দর চোখ বিশিষ্ট সুন্দর সুপুরুষ। আশা করি বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়েছে।

৬. প্রশ্নঃ আমি সুলতান কাযী, চাকুরীজীবি। আমার প্রশ্ন, সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ১ জন পুরুষের বিপরীতে ২ জন নারী কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে, কেন ২ মহিলার সাক্ষ্য ১জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। জেনে রাখুন ইসলামে সব সময় ২ জন মহিলার সাক্ষ্য ১ জন পুরুষের সমান নয়– শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে।

কুরআন শরীফে অন্তত ৫টি আয়াতে পুরুষ অথবা মহিলার কারো উল্লেখ না করেই সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। তবে সূরা বাকারার ২৮২নং আয়াতে দুইজন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

"যখন তোমরা ভবিষ্যতের জন্য অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারে লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখ এবং এতে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে রাখ। যদি ২ জন পুরুষ সাক্ষী না পাও তাহলে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সাক্ষী রাখ যেমন তাদের একজন যদি ভুলে যায় অন্যজন যেন মনে করে দিতে পারে।"

উক্ত আয়াতটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এতে বলা হয়েছে ২ জন পুরুষের সাক্ষী অগ্রাধিকারযোগ্য। শুধুমাত্র ২ জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার সাক্ষ্য নেয়ার কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেউ অপারেশন করতে চায়। সাধারণতঃ সে দুইজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। এখন যদি সে দুইজন সাধারণ দক্ষ সার্জন না পায়, তাহলে সে দুইজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তারের সহযোগিতা সহ ১ জন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। কারণ একজন সার্জন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তারের চেয়ে অপারেশনের ক্ষেত্রে অনেকবেশি দক্ষ। যেহেতু ইসলাম অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা পুরুষদের কাঁধে তুলে দিয়েছে তাই তারা মহিলাদের তুলনায় অর্থনৈতিক বিষয়ে অনেক বেশি দক্ষ। এজন্যই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি ২ জন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে শুধু তখনই ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে। অনুরূপভাবে সূরা মায়েদার ১০৬নং আয়াতে বলা হয়েছে,

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَنِ -

"যদি কেউ উত্তরাধিকারের উইল করে তবে সে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে।"

এখানেও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপার রয়েছে তাই পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

অনেক বিচারক বলেন যে, যখন কোন মহিলা খুনের ব্যাপারে সাক্ষাৎকার দেন, তখন তার নারী প্রকৃতি তাকে বাধা দিতে পারে এবং তিনি খুনের ঘটনাটি নিয়ে ভীত থাকতে পারেন। এজন্যই খুনের ক্ষেত্রেও দুইজন মহিলার সাক্ষী ১ জন পুরুষের সাক্ষীর সমান বলে বিবেচিত হয়।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন এবং খুনের সাক্ষ্য এ দুটি ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমান বলে প্রযোজ্য। কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ এর বিরোধীতা করে বলেন, যেহেতু কুরআনের সূরা বাকারার-২৮২ আয়াতে উল্লেখ আছে যে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, তাই সকল ক্ষেত্রেই দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান ধরতে হবে। চলুন আমরা পবিত্র কুরআনকে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করি। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ -

"যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোন সাক্ষী না পায় তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।"

এতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। চাঁদ দেখার ক্ষেত্রেও একজন মহিলা সাক্ষীই যথেষ্ট। অনেক বিচারক বলেন, "রমজানের শুরুতে একজন সাক্ষী এবং রমজানের শেষে দুইজন সাক্ষী দরকার, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোক না কেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সাক্ষী গ্রহণযোগ্যই নয়–কেবল মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। যেমন, একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার শেষ গোসলের সাক্ষী কেবল মহিলারাই দিতে পারে। শুধুমাত্র খুব বেশি সংকটের সময়ই মৃত মহিলার স্বামী গোসল দিতে পারেন। এখানে মহিলাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আশা করি বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন।

৭. প্রশ্নঃ আমি শায়লা, আমার প্রশ্ন হলো, কেন ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হল? একজন পুরুষকে কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বোন জিজ্ঞেস করেছেন, ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়ার কারণ কী। বহুবিবাহ মানে হল একাধিক স্ত্রী বা স্বামীকে বিয়ে করা। যদি কোন পুরুষের একাধিক মহিলাকে বিয়ে করে তবে তাকে 'বহুপত্নীক' বিবাহ বলে। আর যদি কোন মহিলা একাধিক পুরুষকে বিয়ে করে তবে তাকে বহুপতি বিবাহ বলা হয়। বোন জিজ্ঞেস করেছেন কেন, একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? এর উত্তর দেয়ার আগে কিছু বলে নেয়া দরকার। কুরআনই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, "কেবল একজনকে বিয়ে কর" অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই যাতে এ কথা বলা আছে। গীতা, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোথাও বলা হয়নি- "কেবল একজনকে বিয়ে কর", কেবল কোরআনেই বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাজাদেরই একাধিক স্ত্রী ছিল– যেমন রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এদের একাধিক স্ত্রী ছিল। ১১ শতাব্দীতে ইহুদী আইনে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল রাব্বী গার্ডসাম বেঞ্জাহুদা একটি সিগনর্ড (Signord) প্রস্তাবে বলেন, "বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত।" ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত সেপট্রানিক ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে বহুপত্নীক বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলের প্রধান রাবাইনাইট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। খ্রীষ্টান বাইবেলও বহুপত্নীক বিবাহ অনুমোদন করে– মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে চার্চ এটি নিষিদ্ধ করে। হিন্দু আইনেও একজন পুরুষের একাধিক বিয়ে করার অনুমতি ছিল। ১৯৫৪ সালে যখন হিন্দু আইন পাশ হয় তখন একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। একটি জরিপ সংস্থার 'ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা' বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৭৫ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৬, ৬৭) মুসলমানদের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহের হার ৪. ৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫. ০৬। চলুন পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে আসল বিষয়ে আলোচনা করি, কেন ইসলাম বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দিয়েছে? সূরা নিসার ৩নং আয়াতে আছে,

"তুমি তোমার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে কর। দুইটি, তিনটি অথবা চারটি কিন্তু তুমি যদি ন্যায়বিচার না করতে পার, তবে শুধুমাত্র একজনকে বিয়ে কর।"

'কেবলমাত্র একজনকে' কথাটি কেবল কুরআন শরীফেই আছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের পুরুষদের অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। এমন অনেক লোক ছিল যাদের শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত ছিল। ইসলাম এখানে একটি সীমা আরোপ করে দিয়েছে– সর্বোচ্চ চার। একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, দুইজন, তিনজন অথবা চারজনের মাঝে ন্যায়বিচার এবং সাম্য বজায় রাখতে হবে। নতুবা কেবলমাত্র একজন। সূরা নিসার ১২৯ তম আয়াতে বলা হয়েছে। "স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায়

রাখা একজন পুরুষের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ।" তাই বহুপত্নীক বিবাহ হলো ব্যতিক্রম। এটি কোন আইন নয়– যা অনেকে মনে করেন। ইসলামে পাঁচ ধরনের আদেশ এবং নিষেধ রয়েছে। প্রথমত 'ফরয' বা 'আবশ্যকীয়'। দ্বিতীয় হলো উৎসাহমূলক', তৃতীয় হল 'অনুমোদনযোগ্য', চতুর্থ প্রকার হল 'অনুৎসাহমূলক' এবং সর্বশেষ হল 'নিষিদ্ধ'। বহুপত্নীক বিবাহ হল তৃতীয় ধরনের 'অনুমোদনযোগ্য'। কোরআন কিংবা হাদীসের কোথাও এমন কোন কথা নেই যে, ব্যাক্তি একাধিক স্ত্রী বিয়ে করেছে, সে যে একজনকে করেছে তার চেয়ে ভাল মুসলমান।

প্রকৃতিগতভাবে ছেলে এবং মেয়ে একই হারে জন্ম নেয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মেয়ে ভ্রূণ ছেলে ভ্রূণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়। ফলে ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু প্রকৃতিগতভাবেই অধিক প্রতিরক্ষাশক্তি পায়– মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে জীবাণু ও রোগের সাথে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি। আবার যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি নিহত হয়। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে প্রায় পনের লাখ লোক নিহত হয়েছে– যার বেশির ভাগই পুরুষ। পরিসংখ্যান মতে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা দুর্ঘটনায় বেশি সংখ্যায় নিহত হয়। সিগারেট সেবনের কারণে মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি মারা যায়। ফলে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে মহিলারা সংখ্যায় বেশি। ভারতেও পুরুষের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। প্রতিবছর ১০ লাখেরও বেশি মেয়ে ভ্রূণ হত্যা করা হয়, তাই মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। নতুবা যদি এই মেয়ে শিশুহত্যা বন্ধ করা হয় তবে কয়েক দশকের মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই পুরুষের সংখ্যার চেয়ে ১০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে ৭৮ লক্ষ মহিলা বেশি। শুধু ইংল্যান্ডেই পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৭০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। একমাত্র আল্লাহই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ একজন করে মহিলা বিয়ে করে তাহলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহিলা বেশি থেকে যাবে যারা বিয়ে করার মতো সঙ্গী খুঁজে পাবে না। মনে করুন আমার বোন সেই ৩০ লক্ষের একজন, যে এখনো কোন সঙ্গী পায়নি। এখন তার যে উপায়গুলো আছে তা হলো হয় সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা জনগণের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে– তৃতীয় অন্য কোন উপায় নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এই প্রশ্নটি শত শত অমুসলমানের কাছে করেছি, তারা প্রথম উপায়টিই বেছে নিয়েছে, একজনও ২য় টির পক্ষে মত দেননি। অনেকেই বললেন, আমি আমার বোনকে কুমারী রাখাকেই ভাল মনে করব। বিশ্বাস করুন, চিকিৎসা বিজ্ঞান-এর মতে, কোন পুরুষ অথবা মহিলার পক্ষে সারা জীবন কুমার বা কুমারী থাকা অসম্ভব। সারা জীবন অবৈধ যৌন সংসর্গ ছাড়া কেউই কুমারী থাকতে পারে না, কারণ প্রতিদিন মানুষের দেহে যৌন হরমোন তৈরি এবং নিসৃত হচ্ছে। যেসব সাধকেরা নিজেদের কুমার বলে দাবী করেন। পাহাড়ে পর্বতে, হিমালয়ে যাবার সময় পেছনে দেব-দেবীদের নিয়ে যান। এক গবেষণার রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের চার্চের প্রাদী এবং সন্ন্যাসিনীদের অধিকাংশই ব্যাভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোন উপায় নেই, হয় এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে অথবা সকলের গণসম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে।

৮. প্রশ্নঃ কোন্ কোন হালতে বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য? প্রশ্নটি করেছেন বোন সামিয়া।

ডা.জাকির নায়েক ঃ কেবল একটি শর্ত আছে যা পূরণ করলে কেউ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। আর তা হলো তাকে দুই, তিন অথবা চারজন তার প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে। যদি তা সক্ষম না হয় তবে কেবল একটি বিয়ে করা উত্তম। কিন্তু এমন কতগুলো অবস্থা আছে যখন একজন পুরুষের উচিত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা। যেমন একটি হলো অতিরিক্ত মহিলা, যারা স্বামী পাচ্ছেন না তাদের নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য এটা করা যেতে পারে। আরো অনেক অবস্থা আছে, যেমন– একজন মহিলা বিয়ে করার পর দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে, ফলে সে তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম। তখন স্বামীকে হয় প্রথম স্ত্রী রেখে অন্য আরেকটি মহিলাকে বিয়ে করতে হবে অথবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে হবে। ধরুন আপনার বোনের এমনটি হলো এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গেল– আপনি কোনটিকে চাইবেন? আপনি কী চাইবেন আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোনকে তালাক না দিয়ে বিয়ে করবে? নাকি চাইবেন তালাক দিয়ে বিয়ে করুক? ধরুন কারো স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার ফলে স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারে না। এমতাবস্থায় এটাই ভাল নয় কী সে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, যে তার সন্তান-সন্তুতি ও অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, পরিচারিকা রাখলেইতো চলে। আমিও তাদের সাথে একমত যে, পরিচারিকা রাখা যেতে পারে, সে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে দেখাশোনা করবে। কিন্তু আপনার দেখাশোনা করবে কে? তাই এটিই ভাল নয় কী, আপনি আরেকটি বিয়ে করবেন এবং দু'জনের প্রতি সমান ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে যে, আপনার বিয়ের বেশ কিছু বছর পরও সন্তান হয়নি এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনই সন্তানের জন্য আগ্রহী। স্ত্রী আরেকজনকে বিয়ে করার অনুমতি দিতে পারেন এবং তারা সন্তান পেতে পারেন। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, 'দত্তক গ্রহণ করলেইতো চলে'। অনেকগুলো কারণে ইসলাম দত্তক গ্রহণকে সমর্থন দেয় না– কারণগুলো এখানে বলছি না। ফলে একটি উপায় হয় আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে। অথবা প্রথম স্ত্রীকে রেখেই আরেকজনকে বিয়ে করবে।

৯. প্রশ্নঃ আমি ইলিয়াস। মহিলারা রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন কিনা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ পবিত্র কুরআন কারীমে কোথাও এ কথা উল্লেখ নেই যে, একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। কিন্তু অনেকগুলো হাদীস এর সাক্ষ্য দেয়, যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে "যে সমাজ মহিলাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সফল হবে না।"

কিছু গবেষক বলেন, "এটি শুধু একটি বিশেষ সময়ের জন্য যার সাথে হাদীসটি সম্পর্কিত। বিশেষত, যখন পারস্য সমাজ একজন রাণীকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে।" আবার অন্যদের মতে, এটা সকল সময়কেই বুঝিয়েছে। চলুন, আমরা খতিয়ে দেখি, একজন মহিলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিনা। যদি ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলা প্রধান হন, তবে নিয়মানুযায়ী তাকে নামাযের ইমামতি করতে হবে। যদি একজন মহিলা কোন নামাযে ইমামতি করে তবে তাকে 'কিয়াম, রুকু ও সিজদাসহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। যদি পুরুষদের জামায়াতের সামনে কোন মহিলা এগুলো করে, তবে এটা নিশ্চিত যে, তা নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবে। বর্তমান সমাজে একজন মহিলা রাষ্ট্রের প্রধান হলে তাকে বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থাকতে হয়, যেখানে পুরুষরাও উপস্থিত থাকে। অনেক সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়, যেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না কিন্তু ইসলাম কোন পুরুষের সাথে কোন নারীর এরকম রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনুমোদন দেয় না। রাষ্ট্রপ্রধানকে অনেক সময় অন্যান্য

রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে- যাদের অধিকাংশই পুরুষ-ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়, ছবি উঠাতে হয়, করমর্দন করতে হয়- যা ইসলাম নারীর জন্য কখনোই অনুমোদন দেয় না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে সর্বক্ষণ সাধারণ জনগণের সাথে মিশতে হয়। তাদের সমস্যাসমূহ সমাধান করতে হয়। বিজ্ঞান আমাদের বলছে, একজন মহিলার মাসিক রক্তস্রাব চলাকালীন সময় তার কতগুলো আচরণগত, মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন দেখা যায়- ফলে হরমোন এ পরিবর্তন তাকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞান আরো বলে যে মহিলাদের পুরুষের তুলনায় অধিক কণ্ঠ ও মৌখিক শক্তি রয়েছে এবং পুরুষের ভবিষ্যত সম্পর্কে কল্পনা করার শক্তি রয়েছে- যা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর মেয়েদের মৌখিক দক্ষতা তার মাতৃত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মহিলা গর্ভবতী হতে পারেন এবং এ সময় তার কয়েকমাসের বিশ্রাম প্রয়োজন- এ সময়টিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কী হবে? আবার মা হিসেবে সন্তানদের লালন পালন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তখন যদি একই সাথে ছেলেমেয়েদের লালন পালন ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্যই তা করা অধিকতর সম্ভব- বাস্তবিক কারণেই। সুতরাং, আমিও সেসব বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা বলেন, 'মহিলাদের রাষ্ট্রপ্রধান করা উচিত নয়'। কিন্তু এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারবে না। তাদের মতামত প্রদান ও আইন প্রণয়নে অংশ নেয়ার আইনত অধিকার আছে। হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালমা (রা) রাসূল (সা)- কে সমর্থন ও নির্দেশনা দিয়েছেন- যখন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় সমস্যায় ছিল। সুতরাং নিশ্চতভাবেই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

১০. প্রশ্নঃ আমি ভিমলা দালাল। আইনজীবী। যেহেতু ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে ইসলাম কেন তাদেরকে পর্দায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আগেই অনেকবার বলেছি যে, ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় অনুমোদন করে না। পবিত্র কুরআনে 'হিজাবে'র কথা উল্লেখ আছে। সেখানে নারীদের 'হিজাবে'র কথা বলার আগে পুরুষদের হিজাবের কথাও বলা হয়েছে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আছে যে, 'একজন ইমানদারের উচিৎ দৃষ্টি অবনত রাখা এবং তার পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।' পরবর্তী আয়াতে আছে, ইমানদার মহিলাদের বলুন, সে যেন তার চোখ অবনত রাখে। পবিত্রতা অবলম্বন করে এবং যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে- এবং ওড়না দ্বারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে- বাবা, ছেলে এবং স্বামী ছাড়া, হিজাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কুরআন হাদীসে দেয়া আছে। এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য। ১ম হুকুম,- যা পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ভিন্ন। পুরুষকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জী ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখতে হবে। ২য় হুকুম, মহিলাদের কাপড় এরকম টাইট হওয়া যাবে না যার ফলে দেহকাঠামো স্পষ্ট বুঝা যায়। ৩য় হুকুম, কাপড় স্বচ্ছ হওয়া যাবে না। ৪র্থ হুকুম, এরকম আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। ৫ম হুকুম, এরকম পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। ৬ষ্ঠ এবং সর্বশেষ হুকুম হল, এরকম পোশাক পরা যাবে না, যা অবিশ্বাসীদের পোষাকের সাথে মিলে যায়। এ ছয়টি হল হিজাবের বৈশিষ্ট্য বা হুকুম। এখন প্রশ্নের উত্তরে আসছি-কেন ইসলাম পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় অনুমোদন করে না। চলুন, পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজকে বিশ্লেষণ করে দেখি। বর্তমানে যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংগঠিত হয় সে দেশটি হল যুক্তরাষ্ট্র। এফ. বি. আই (FBI) এর ১৯৯০ সালের এক রিপোর্ট মতে

حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۔

"আহলে কিতাবদের যেসব মহিলা বিশ্বাসী এবং সতী, তাদেরকে তোমাদের জন্য বিয়ে করা বৈধ করা হয়েছে।"

ইসলাম এ জন্য অনুমতি দিয়েছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবের মহিলা কোন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে তার ঘরে আসে, তাহলে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার নবীদের ব্যাপারে অপমানজনক কিছু বলবে না বা করবে না। কারণ মুসলমানরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সকল নবীর ওপর বিশ্বাস করে। তাই তাদের সম্প্রদায়ের কোন মহিলা যদি আমাদের পরিবারে আসে তবে সে উপহাসের পাত্র হবে না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন মুসলিম মহিলা তাদের পরিবারে যায় তবে সে উপহাসের পাত্র হবে। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে আছে।

"অবিশ্বাসী মহিলাকে ঈমান আনা পর্যন্ত বিয়ে করো না। এমনকি একজন বিশ্বাসী দাসীও অবিশ্বাসী নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাকে আকৃষ্ট করে।"

সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াতে আছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۔

"যারা বলে যে, মরিয়ম মেরীর সন্তান খ্রিষ্ট আল্লাহর সন্তান, তারা ব্লাসফেমী করছে, তারা কুফরী করছে।"

সুতরাং, কুরআন বলছে, আপনি আহলে কিতাবের অনুসারীদের তখনই বিয়ে করতে পারেন যখন তারা বিশ্বাস করে না যে, খ্রীষ্ট প্রভু অথবা প্রভুর ছেলে এবং বিশ্বাস করে যে, বরং তিনি আল্লাহর দূত।

১২. প্রশ্নঃ আমি আকিলা। আমার প্রশ্ন ইসলাম কেন মহিলাদের উইল করতে দেয় না– সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন।

ডা. জাকির নায়েক ঃ ইসলাম পশ্চিমাদের ১৩০০ বছর আগে মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন মহিলা চাই সে বিবাহিত বা অবিবাহিত যাই হোক না কেন, সম্পদের মালিক হওয়া বা পরিত্যাগ করার অধিকার আছে কারো পরামর্শ ছাড়াই। ইসলাম তাকে উইল করার অধিকার দিয়েছে।

১৩. প্রশ্নঃ আমি রোসান রংওয়ালা। আপনি বলেছেন, ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ই সমানাধিকার পায়। তাহলে কেন নারীদেরকেও ৪টি বিয়ের অনুমতি দেয়া হল না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কী ৪টি বিয়ে করতে পারে না?

ডা. জাকির নায়েক ঃ প্রথমত আপনার জানা উচিত, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিক যৌনক্ষমতা সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ দৈহিক ও জৈবিকভাবে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনক ভাবে পূরণ করতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে, মহিলারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তাই অধিকাংশ বিবাদ এই সময়ই হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের মাঝে পরিচালিত এক ক্রাইম রিপোর্ট মতে, সেখানকার বেশির ভাগ মহিলা এ সময়ে বেশী অপরাধ করে থাকে। ফলে একজন স্ত্রী একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে এড্জাস্ট করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আরো বলে যে, যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে তার যৌন রোগের ঝুঁকি খুব বেশি থাকে, যা একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে হয় না। যদি কোন কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের পিতা এবং মাতা সনাক্ত করা খুবই সহজ সাধ্য। অন্যদিকে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে আপনি কেবল তার মাকে সনাক্ত করতে পারবেন, বাবাকে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে যাবে। ইসলাম বাবার সনাক্তকরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'যদি কোন সন্তান তার মা বাবার পরিচয় না পায় তাহলে সে চরম মানসিক অশান্তিতে ভোগে। বহুপতি বিবাহ নিষিদ্ধ করার অনেক কারণ আছে, অপরদিকে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতির পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

উদাহরণ দেয়া যাক যদি কোন দম্পতির সন্তান না থাকে তবে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। ধরুন যদি পুরুষ বন্ধ্যা হয়, তবে স্ত্রী একাধিক স্বামী বিয়ে করতে পারেন? না-পারে না। কারণ, কোন ডাক্তারই ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে স্বামী বন্ধ্যা। এমন কি শুক্রকীটবাহী নাড়ীচ্ছেদ করেও কোন ডাক্তার এটা বলতে পারবে না যে, সে পিতা হতে পারবে না। সুতরাং সন্তানের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অন্যদিকে ধরুন কোন দুর্ঘটনায় স্বামী মারাত্মকভাবে অসুস্থ হল তখন কী স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে পারবে না? চলুন আমরা ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করি। যদি স্বামী দুর্ঘটনায় পড়ে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়, সে তার দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ।

প্রথমত; অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে– সে তার পরিবার, সন্তান এবং স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে নাও পারে। প্রথমটির জন্য ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয়টির জন্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে, স্ত্রীর স্বামীর তুলনায় কমেই সন্তুষ্টি আসে। কিন্তু স্ত্রী যদি চায়, তবে সে তালাক নিতে পারে। তালাক নেয়াই উত্তম যদি সে স্বাস্থ্যবতী হয়। অন্যথায় যদি সে স্বাস্থ্যবতী না হয় অথবা প্রতিবন্ধী হয়, তবে কে তাকে বিয়ে করবে?

১৪. প্রশ্নঃ আমি সরদার হাকিম। আমার প্রশ্ন, আপনি বলেছেন, যদি কোন মেয়ে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে সে 'না' বলতে পারে। যেহেতু সে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। তারা তাকে খেতে দিচ্ছে, দেখাশোনা করছে। 'না' বলার পর কী সে নিরাপদে জীবনধারণ করতে পারে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ কেন পারে না? বিয়ের আগ পর্যন্ত তার ভরণপোষণসহ যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা তার পিতার ও ভাইদের কাজ। যদি সে 'না' বলে, তবে তার পিতা ও ভাইদের দায়িত্ব বলবৎ থাকবে। সে খুব ভালভাবেই 'না' বলতে পারে।

১৫. প্রশ্নঃ আমি প্রকাশ লাট। বিশ্বাসী লোকদেরকে ডাকার জন্য আমি এ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মগ্রন্থেই অনেক ভাল বিষয় রয়েছে। কিন্তু হাজার বছর পরে ধর্মের চর্চা মানুষ নারীদের বৈষম্যমূলক করে ফেলেছে। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়। আমার প্রশ্ন হল, বই এ যা লিখা আছে, বাইবেল, কুরআন অথবা গীতা যাই হোক না কেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে এর চর্চা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি চর্চা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কী লেখা রয়েছে তাতে কী বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কী লেখা আছে, ওই বইয়ে কী লেখা আছে তা বলার চেয়ে কী করা যেতে পারে সেটা বলা দরকার নয় কী।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি উত্তম প্রশ্ন করেছেন–সকল ধর্মগ্রন্থই মঙ্গলের ও কল্যাণের কথা বলে, চলুন আমরা দেখি মানুষ কী চর্চা করে। আমাদেরকে মৌখিক কথাবার্তার চেয়ে চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে– আমিও তাতে একমত। অধিকাংশ মুসলমান কুরআন হাদীসের থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আমরা এখানে লোকদেরকে কুরআন-হাদীসের প্রতি মনোযোগী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশ্নের প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে যে, সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে তাই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলা অনর্থক– আমি আপনার সাথে একমত নই। "ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা" বিষয়ক আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি ইসলামে নারীর মর্যাদা অন্যান্য ধর্মে প্রদত্ত নারীর মর্যাদা এ দুয়ের মধ্যে তুলনা করেছি এবং আপনি যদি আমার সে বক্তব্য শুনে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে, কোন্ ধর্ম নারীকে কি অধিক মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি আপনি যদি একমত হন যে, তত্ত্বীয়ভাবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি। অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমাদেরকে এখন তা অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের কিছু কিছু দিক লোকজন অনুসরণ করছে এবং কিছু কিছু দিক করছে না। যেমন, অনেক দিক দিয়ে কুরআন-হাদীস হতে অনেক দূরে সরে গেলেও সৌদিআরব এখনো ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করছে। আমাদের করণীয় হল, ফৌজদারি শাস্তি বিধানের আইনের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি প্রয়োগযোগ্য হয়, তাহলে তা বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়ন করতে হবে। আর অন্য সমাজে যেখানে সামাজিক জীবনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ রয়েছে, সে সমাজ পরীক্ষা করতে হবে। যদি তা সর্বোত্তম হয়, তাহলে তা অন্যান্য সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা এখানে এটিই বুঝানোর জন্য একত্রিত হয়েছি যে, ইসলামের আইন হল সর্বোত্তম আইন, যদি আমরা এর যথাযথ অনুসরণ না করি তবে আমরা নিজেরা দোষী– ধর্ম নয়। এজন্যই আমরা মানুষকে ডেকেছি, যেন তারা কুরআন-হাদীসকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং তার অনুশীলন করতে পারে। আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

১৬. প্রশ্ন, আমি কামার সাইদ। আপনি বলেছেন, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী ডিভোর্স দেয় তবে তার 'ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু তারপর তার বাবা মা তার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যদি তারা অক্ষম হয় তখন মেয়েটি কী করবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন যে, যদি কোন মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয় তখন স্বামীর দায়িত্ব যে তার স্ত্রীকে ইদ্দত কালীন সময় পর্যন্ত ভরণ- পোষণ করবে, যে সময়টা হয় ৩ মাস বা তার বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ঐ সময়ের পর তাকে ভরণ- পোষণ করার দায়িত্ব ঐ মহিলার পিতা বা ভাইয়ের। যদি তার বাবা বা ভাইদের সে সামর্থ্য না থাকে, তবে তার নিকটাত্মীয়দের উচিত তার দেখাশোনা করা। যদি নিকটাত্মীয়দেরও সামর্থ্য না থাকে, তবে এ দায়িত্ব এসে পড়ে মুসলিম সমাজের ওপর। তাই আমাদের একটি সংগঠন গড়তে হবে এবং যাকাত সংগ্রহ করে এ ধরনের মহিলাদের দেখাশোনা করতে হবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে এটি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা– সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে।

উল্লেখ্য যে, এ কারণেই ইসলাম স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর আদায় করতে বলেছে, যাতে তাকে এ ধরনের করুণ অবস্থায় পড়তে না হয়। ইসলাম নারীকে স্বাবলম্বী দেখতে চায়, তাই তাকে প্রাপ্য মোহর আদায় করার জন্য স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে এবং যারা তা আদায় করবে না তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।– (অনুবাদক)

১৭. প্রশ্নঃ আমি সৈয়দ রিয়াজ, ব্যবসায়ী। আপনি যা বলেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। সুতরাং কেন ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি বিশেষ করে সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, আমি আমার কথায় বলেছি, ইসলামে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার সমান। সুতরাং কেন সে উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান অংশ পাবে না। যেমন লোকেরা বলে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক পায়। প্রশ্নটির উত্তর পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ এবং ১২ নং আয়াতে খুঁজে পাওয়া যায়, তাতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কিভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনে বলছে,

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়ার–) ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন– পুত্রের অংশ দুই কণ্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু দুয়ের বেশি কন্যা থাকে তবে তারা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা থাকে, তবে সে অর্ধেক পাবে। আর পিতামাতা প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে।, আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে তবে তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।

১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

"আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, আর যদি তাদের কোন সন্তান থাকে তাহলে তাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে তবে তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি তোমাদের কোন সন্তান থাকে তবে স্ত্রীরা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত ওসিয়ত বা ঋণ আদায় করার পর।" -সূরা নিসাঃ ১২

সংক্ষেপে বলা চলে, অধিকাংশ সময়ে মহিলারা তার পুরুষ সমশ্রেণীর বিপরীতে অর্ধেক পরিমাণ সম্পত্তি পায় কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণ স্বরূপ বৈপিত্রেয় ভাই বোনের ক্ষেত্রে উভয়েই পাবে সমান এক ষষ্ঠাংশ, যদি তার আপন ভাই না থাকে। মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকলে তার বাবা মা উভয়েই সমান এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আবার যদি মহিলা মারা যায় এবং তার কোন সন্তান নেই সেক্ষেত্রে তার স্বামী পাবে অর্ধেক। তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং বাবা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। এখানে দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাগণ তার সমশ্রেণীর পুরুষ থেকে এমনকি দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়। যেমন উপরোল্লিখিত ব্যাপারে মাতা বাবার চেয়ে দ্বিগুণ পায়। কিন্তু... আমি আপনার সাথে একমত যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের অর্ধেক পায় যখন নারীটি স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, যেহেতু পুরুষ পরিবারের কর্তা এবং যাবতীয় আর্থিক সংস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ এবং আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না, তাই তিনি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি অংশ দিয়েছেন। অন্যথায় এখানে আমাদেরকে "ইসলামে পুরুষদের অধিকার" সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হতো। এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– মনে করুন একজন লোক এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেলো এবং মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তি তার ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে

বন্টন করা হলো। তার সম্পত্তির মূল্য যদি দেড় লক্ষ টাকা হয় তবে ইসলামী শরীয়ার মতে, তার ছেলে পাবে ১ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু ছেলে পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ এখন সংসারের জন্য তার ব্যয় করতেই হবে- তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। কিন্তু মেয়েটিকে তার পরিবারের জন্য ১ পয়সাও খরচ করতে হবে না। আমার মনে হয় এখন ব্যাপারটি সকলের কাছে পরিষ্কার যে, কেন ইসলাম পুরুষকে নারীদের তুলনায় বেশি অংশ দিয়েছে।

১৮. প্রশ্নঃ আমি বিজয়, মুম্বাই আই আইটির ছাত্র। আমার প্রশ্ন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ ইসলাম সমর্থন করে না, এটি কী ইসলামে আধুনিকতা নাকি সেকেলে ধারণা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ 'আধুনিকতা' বলতে যদি আপনি বুঝান যে আপনার স্ত্রী কিংবা বোনকে আপনি বিক্রয় পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করবেন যাতে তারা অন্যদের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায় অথবা আপনি তাকে দিয়ে 'মডেলিং' করাবেন, সেক্ষেত্রে আমি বলব ইসলাম সেকেলে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা মিডিয়াতে নারীদের সম্পর্কে বলে যে, তারা মহিলাদের অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে এবং তারা নারীদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে তারা নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্নই করেছে।

পরিসংখ্যান মতে, আমেরিকায় ইউনিভার্সিটি কিংবা কর্মক্ষেত্রে গমনকারী ৫০% ধর্ষণের শিকার হয়। আপনি কী চিন্তা করতে পারেন ৫০% নারী! কিন্তু কেন? কারণ হল যেখানকার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। এখন আপনার কাছে যদি একজন মহিলা ধর্ষিতা হওয়া 'আধুনিকতা' মনে হয় তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম 'সেকেলে'। আর যদি আপনি বলেন না তবে ইসলাম অতি আধুনিক।

১৯. প্রশ্নঃ আমি সুজাত। আমার প্রশ্ন মহিলাগণ কী এয়ারহোস্টেসের চাকরি করতে পারবে? কারণ এটি শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আমি আপনার সাথে একমত যে, এটি অধিক বেতনের চাকরি। কিন্তু এটি শালীন চাকরি কিনা তা বিশ্লেষণ করতে হবে। এয়ার হোস্টেস হিসেবে সাধারণত ঐসব মেয়েদের বাছাই করা হয় যারা সুন্দরী। আপনি কখনো অসুন্দরী মেয়ে সেখানে খুঁজে পাবেন না। এবং তাদেরকে হতে হবে তরুণী ও আকর্ষণীয়।

তাদেরকে এমন পোষাক পরিধান করতে হয় যা সাধারণত ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী। তাদেরকে এমনভাবে অঙ্গসজ্জা করতে হবে যাতে যাত্রীরা তাদের দেখে আকৃষ্ট হয়। এয়ার হোস্টেসদের কাজ হচ্ছে তাদের যাত্রীদের প্রয়োজন পূরণ, সেখানে অধিকাংশ যাত্রীই হল পুরুষ– এবং সেখানে তাদের মধ্যে নৈকট্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা অপ্রয়োজনীয়ভাবে এয়ার হোস্টেসদের সাথে আলাপ করে, যদিও এয়ার হোস্টেস তা পছন্দ না করে তথাপি তাকে তার কথার উত্তর দিতে হয়, অন্যথায় তার চাকরি চলে যাবার ভয় থাকে। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা বলে "ম্যাডাম অনুগ্রহ করে আমার সিট বেল্ট বেধে দিন।" তখন এয়ার হোস্টেসের কোন উপায় থাকে না, তাকে বাধ্য হয়ে সিট বেল্ট বেঁধে দিতে হয়। তাহলে এভাবে কী ঘটতে যাচ্ছে?.. এখানে বিপরীতমুখী দুই লিঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বা নৈকট্য সৃষ্টি হচ্ছে।

অনেক এয়ারলাইন্সে এয়ার হোস্টেসদের মদ সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকে। ইসলামে পুরুষ-মহিলা সবাইকে মদ সরবরাহ বা পান করতে এবং মদের সাথে সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর এসকল কাজের জন্যই শুধুমাত্র নারীদেরকে এয়ার হোস্টেস হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। ঐ বিমানে অনেক পুরুষ কর্মচারী

থাকলেও তাদেরকে এসব কাজে ব্যবহার করা হয় না, তারা সাধারণত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে। প্লেনে এ ধরনের বিপরীতমুখী কাজের ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস করুন কোন বিমানই মহিলা কর্মচারী ছাড়া চলে না। এমনকি 'সৌদি এয়ারলাইন্স'ও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও এটি শ্রেষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র সৌদি আরব কর্তৃক পরিচালিত হয়। যদিও সৌদি মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হয় না ফলে তাদেরকে বাইরে র দেশ হতে মহিলা এয়ার হোস্টেস আমদানী করতে হয়। যদিও এটি সৌদি আরবের মত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তবুও তাদের কাছে এর কোন বিকল্প নেই।

বিমানচালনা এমন একটি পেশা– যেখানে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মহিলা এয়ার হোস্টেস রাখতে হয়। বিমান চালনা সংস্থায় এমন কতগুলো নিয়ম আছে যা শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন। উদাহারণস্বরূপ 'এয়ার ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স' নিয়ম হচ্ছে, 'এয়ার হোস্টেস নির্বাচিত হওয়ার পর চার বছরের মধ্যে বিয়ে করতে পারবে না'। কিছু এয়ারলাইন্স এর নিয়ম হল, কোন এয়ার হোস্টেস যদি গর্ভবতী হয় তবে তার চাকরি শেষ হয়ে যাবে'। কল্পনা করুন! কিছু এয়ারলাইন্স বলে 'তোমার অবসর বয়সসীমা ৩৫ বছর'। কিন্তু কেন? কারণ তুমি আর তখন যথেষ্ট আকর্ষণীয় নও। আপনি কী এটাকে শালীন চাকরি বলবেন?

২০. প্রশ্নঃ আমি রশীদ শেখ ছাত্র। আমার প্রশ্ন ইসলামে সহশিক্ষার অনুমতি আছে কিনা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ সহশিক্ষা বলতে যদি আপনি বুঝেন একই স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ছেলে-মেয়ে একই সাথে পড়া, তবে প্রথমতঃ আসুন আমরা যেখানে সহশিক্ষা চালু আছে অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়ে একই স্কুলে পড়াশুনা করে এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশ্লেষণ করি। গত বছর সহ শিক্ষা ও একক শিক্ষা দানকারী স্কুলের ওপর জরিপের পর-The world this week 'নামক একটি রিপোর্ট যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো এবং জরিপকারীরা বলেছেন একক শিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো ও সহশিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো থেকে অনেক ভাল। যখন শিক্ষকদের সাক্ষাতকার নেয়া হলো তখন তারা বললেন, "একক শিক্ষাদানকারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্রদের থেকে পড়ালেখায় অনেক মনোযোগী। কিন্তু ছাত্ররা জানান তারা সহশিক্ষাই পছন্দ করে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এর কারণ কী? জরিপে স্পষ্টত দেখা যায় যে, সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা একটি উল্লেখযোগ্য সময় বিপরীত লিঙ্গের নিকট জনপ্রিয় হওয়ার জন্য ব্যয় করে।

অধিকন্তু পড়াশুনায় মনোযোগী না হলে ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তারা খুব স্মার্টভাবে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারা স্কুলে পড়াশুনা করার চেয়ে ডেটিংয়ে অধিক সময় ব্যয় করে। জরিপের দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্য সরকার অধিকহারে একক শিক্ষা দানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছে। এক আমেরিকান রিপোর্টে বলা হয়েছে– মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ক্লাসমেটদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ যৌন শিক্ষা বা কৌশল শিখতে বেশী সময় ব্যয় করে। ভারতেও এমন ঘটনা ঘটছে কম বা বেশি হারে অহরহভাবে।

চলুন, আমরা এবার সহশিক্ষা দানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণে আসি। এ রিপোর্টে স্কুল সম্পর্কে যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তীব্র হারে দেখা যায়। ১৯৮০ সালের ১৭মার্চ "নিউজ উইক" এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পরিমাণে যৌন আক্রমণ হচ্ছে নারীদের ওপর। আমি এ রিপোর্টের পুরো উল্লেখ করতে পারব না, কারণ সময় সীমিত, কিন্তু প্রধান

দিক হল, "প্রফেসর এবং লেকচারাররা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল গ্রেড প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে যৌন হয়রানি করে, ফলে শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ কমে যায় এবং শিক্ষার মানও নিচে নেমে যায়। গত বছর একটি দূর্ঘটনা পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে– আমি কলেজটির নাম ভুলে গেছি, যেখানে একটি মেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য দিবালোকে ৪/৫ জন ছাত্র কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। গত ২৬ আগষ্ট 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' প্রকাশিত রিপোর্ট- যেটি 'নিউইয়র্ক টাইমস' এ প্রকাশিত হয়েছে– এতে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের ২৫% ধর্ষিতা হয়।

আমার মূল প্রশ্ন হলো– আপনি কী আপনার সন্তানকে স্কুল-কলেজে পাঠাবেন পড়াশুনার জন্য নাকি যৌন কৌশল শেখার জন্য নাকি যৌন হয়রানীর শিকার হওয়ার জন্য? যদি প্রথমটি হয় তবে আমি আপনাকে উপদেশ দেব সহশিক্ষায় ভর্তি না করানোর জন্য আর যদি পরেরটি হয় তবে আপনিই ভাল বুঝবেন আপনি কী করবেন।

২১. প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন, কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যা করার মত কতজন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং পুরুষদের তুলনায় তাদের সংখ্যা কত শতাংশ?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সমকালীন এমন অনেক মহিলা সাহসী ছিলেন যারা শুধু হাদীস ব্যাখ্যাই করতেন না তারা সেগুলো মুখস্থও রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রধান কথা হল বর্তমানে কতজন নারী 'আলেম' আছেন? এবং আপনি তার শতকরা হার জানতে চেয়েছেন। মুম্বাইতে অনেক মহিলা আলেমা রয়েছেন এবং অনেক মুসলিম সংগঠনও রয়েছে এমনকি দারুল উলুম নদওয়াতেও। অন্যান্য জায়গাতে যেমন মুম্বাইর 'ইসলাহ-উল-বানাত' এ অনেক মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা নারী আলেম তৈরী করেন। যদিও আমি তাদের শতকরা হার জানিনা তবে জানি সংখ্যায় তারা শত শত।

২২. প্রশ্নঃ আমি জেনিফার। আমার প্রশ্ন শুধুমাত্র স্বামীই কী স্ত্রীকে 'তিন তালাক' বলতে পারে? যদি কোন নারী তালাক বা 'ডিভোর্স' নিতে চান তবে তাকে কী করতে হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে কিন্তু একজন নারীও কী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে? এর উত্তর হচ্ছে একজন মহিলা তালাক দিতে পারে না, কারণ 'তালাক' আরবি শব্দটি 'ডিভোর্স' অর্থে ব্যবহার করা হয়– যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে পারে, স্ত্রী তার স্বামীকে দিতে পারবে না। ইসলামে তালাক পাঁচ ধরনের হয়।

প্রথমটি ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে বলবে, আমরা আর একসাথে ঘর করতে পারবনা চলো, আমরা একে অন্যকে ছেড়ে দেই।

দ্বিতীয়টি ঃ স্বামীর একক ইচ্ছায় একেই তালাক বলে; যেখানে স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর পরিশোধ করতে হবে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদেয় সকল উপহারও ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয়টিঃ স্ত্রীর একক ইচ্ছায়। যদি সে তার বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ করে থাকে। যদি সে তার নিকাহনামায় এটি উল্লেখ করে তবে এককভাবে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারবে– এটাকে 'ইসমা' বলা হয়। আমি কখনোই কাউকে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার পদ্ধতি ইসমা সম্পর্কে বলতে শুনিনি।

চতুর্থ ঃ যদি স্বামী তার সাথে খারাপ আচরণ করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তখন তার 'কাজীর' কাছে যাওয়ার অধিকার আছে এবং বিয়ে বাতিল করার আবেদন করতে পারবে। একে "নিকাই-ই-ফাসেক" বলা হয়। তখন কাজী তার ইচ্ছানুযায়ী স্বামীকে তার পুরো মোহর অথবা মোহরের অংশবিশেষ পরিশোধ করতে নির্দেশ দিবে। পঞ্চম ও সর্বশেষটি– এক্ষেত্রে যদিও স্বামী সব দিক থেকে ভাল হয় এবং তার সম্পর্কে স্ত্রীর কোন প্রকার অভিযোগ না থাকে কিন্তু তার ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে পছন্দ করে না– তখন সে তাকে তালাক দেয়ার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করতে পারে আর এটাই হল 'খোলা'। কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্য, নারী যে স্বামীকে তালাক দেয়ার এ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারে সে কথা কেউ বলে না। কিছু আলেম-ওলামা আছেন যারা এ পাঁচ ধরনের তালাক ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করেন; কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইসলামে তালাক পাঁচ ধরনের।

২৩. প্রশ্নঃ ইসলামে নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ কুরআন এবং হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নেই যা মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। কিছু লোক একটি নির্দিষ্ট হাদীস উল্লেখ করে বলেন যে, মোহাম্মদ (সা) বলেছেন–"মহিলাদের জন্য মসজিদ হতে বাড়ীতে নামায পড়া উত্তম এবং তার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষে নামায পড়া বেশি উত্তম।"

ঐসব লোকেরা শুধুমাত্র অন্য সকল উৎস বাদ দিয়ে একটি উৎস ধরে। আপনাকে এ হাদীসের প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। মোহাম্মদ (সা) বলেছেন যে, "মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া একাকী পড়ার চেয়ে ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের কাজ।" তখন একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর নবী! 'আমাদের শিশু বাচ্চা রয়েছে, আমাদের সাংসারিক কাজ করতে হয়... সুতরাং কিভাবে আমরা মসজিদে যাব? এর উত্তরে নবী (সা)-বললেন যদি কোন মহিলা ঘরে নামায পড়ে তবে এটা তার জন্য মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম; ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার নিবিড় কক্ষে নামায পড়া আরো উত্তম।" যদি তার বাচ্চা থাকে অথবা তার কোন সমস্যা থাকে তবে ঘরে নামায আদায় করলেও সমান সওয়াব পাবে। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিষেধ করে না। এরকম একটি হাদীস হল– "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা মহিলা তাদেরকে তোমরা মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দিও না।"

অন্য এক হাদীসে এসেছে- "নবী করিম (সা) স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে চায়, তবে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।" আরো কতগুলো হাদীস আছে আমি এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যেতে চাই না। কিন্তু ইসলাম নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে তার জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে–কারণ ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নয়। ইসলাম নারী- পুরুষদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়? ইসলাম যদি মসজিদে এরকম করার সুযোগ দেয় তবে এখানেও তাই ঘটবে যা সচরাচর অন্য ধর্মীয় স্থানে ঘটে– এতে পুরুষরা নামায পড়ার জন্য নয় তাদেরকে বরং তাদেরকে টিজিং ও কুনজর দেয়ার জন্য অধিক হারে মসজিদে আসবে, তাই ইসলাম বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়। মসজিদে পর্যাপ্ত আলাদা আলাদা প্রবেশ দ্বার থাকতে হবে, মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা ওজুর ব্যবস্থা থাকতে হবে। মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদাভাবে দাঁড়ানোর জায়গা হবে এবং মহিলাগণ পুরুষদের

পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে– কেননা যদি পুরুষরা মহিলাদের পেছনে দাঁড়ায় তবে সেখানে বাজে একটি পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের নামাযে মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটবে। ইসলামের বিধানানুযায়ী নামাযে কাঁধ মিলিয়ে কাঁধে দাঁড়াতে হয়– সেক্ষেত্রে ডাক্তারগণ বলেন যে, মহিলাদের দেহে সাধারণত পুরুষদের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার পাশে কোন মহিলা দাঁড়ায়, আপনি উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভব করবেন তখন আপনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে স্বভাবতই নারীটির প্রতি মনোনিবেশ করবেন। আর এজন্যই নারীদেরকে পুরুষদের পাশে না দাঁড়িয়ে তাদের পিছনে আলাদাভাবে দাঁড়ানোর কথা বলেছে। আপনি যদি সৌদি যান, সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে নামায পড়ছে, এমন কি আমেরিকাতেও নারীরা মসজিদে যায়। কেবল ভারত ও অন্য কতিপয় রাষ্ট্রে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখে। আপনি মক্কার মসজিদে হারামে বা মদীনার মসজিদে নববীতে গেলে দেখবেন মহিলারা মসজিদে এসে নামায পড়ছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভারতের কোন কোন মসজিদে এমনকি মুম্বাইয়েরও কিছু মসজিদে এখন নারীদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমি আশা করব এরকমভাবে অন্যান্য মসজিদেও এ ব্যবস্থা চালু হবে।

২৪. প্রশ্নঃ আমার প্রশ্ন আজকের এ সম্মেলনটি "ইসলামে নারীর অধিকার" এর ওপর, কিন্তু মঞ্চে একজনও নারী আলোচক কেন নেই? কেন শুধু পুরুষ? যদি ব্যাপারটি এরকম হয় যে, এটি এখানকার মহিলা শ্রোতাদের সন্তুষ্ট না করে তবে কাদের জন্য এ সম্মেলন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, কেন মঞ্চে একজনও নারী আলোচক নেই। আপনাকে বলছি প্রতি শুক্রবার আমাদের সংগঠনের (IRF) কর্মসূচিতে মহিলা আলোচক থাকেন, যেখানে তারা আলোচনা করেন। এখানে আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছি। আমি একজন পুরুষ আলহামদুলিল্লাহ, আজকের প্রধান অতিথি এবং এ অনুষ্ঠান সমন্বয়কারীসহ সকলেই পুরুষ। এখানে আরো কর্মসূচি হবে যেখানে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথিসহ সকলেই মহিলা থাকবে। ইনশাআল্লাহ এরকম অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ করব।

২৫. প্রশ্নঃ স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায় তাকে কী তার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ এটি স্বামীর জন্য জরুরী নয় যে, দ্বিতীয় বিয়ে করতে হলে তার প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে– কেননা কুরআনে রয়েছে– "তুমি একাধিক বিয়ে করতে পারবে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীদের মধ্যে (পূর্ণাঙ্গভাবে) ন্যায়বিচার করতে পারো।"

তবে এটি অবশ্যই উত্তম যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার আগে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া এবং তার দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীকে জানানো তার কর্তব্য– কেননা ইসলাম বলে– "যদি তোমার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তোমাকে অবশ্যই তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে হবে।"

কিন্তু যদি প্রথম স্ত্রী অনুমতি দেয়, তবে স্বামী ও তার দুই স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা বিরাজ করবে। কিন্তু এটি জরুরী নয়, তবে যদি বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ থাকে তবে তাকে অবশ্যই অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে হবে। যদি এমন চুক্তি থাকে "তুমি স্ত্রী থাকাকালীন আমি কাউকে বিয়ে করব না।" কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং ভাল।

২৬. প্রশ্নঃ আমি ইয়ার হোসাইন। আমার প্রশ্ন ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়, তবে কিভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে যুদ্ধ করত?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, যদি ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস না করে, তবে কিভাবে তারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে কাজ করেছে? আপনি যদি আমার কথা ভালোভাবে শুনে থাকেন, আমি সেখানে বলেছিলাম "এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা পর্দা রক্ষা করত, তবে সেখানে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে।"

আপনি যদি 'সহীহ বোখারী' পড়ে থাকেন, সেখানে রয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু স্বাভাবিক সময় তাদের পা ঢাকা থাকত। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের ঘোড়ায় চড়ারও নজির রয়েছে, তখন তাদের খালি পা দেখা যেত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম পর্দার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়েছে তবে এর মানে এ নয় যে, ইসলাম তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়েছে– যেরকম দেখা যায়, আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে; বরং তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী পোশাক বজায় রেখে চলত।

২৭. প্রশ্নঃ আমি মোহাম্মদ আসলাম গাজী। আমার প্রশ্ন, ভিডিও ফিল্ম, নাচ-গান, ম্যাগাজিন ও সহ-শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃতির কারণে বর্তমান সময়ে যৌন অরাজকতা ভয়ংকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে– সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে কী বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করার ব্যাপার আমরা তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বর্তমানে যৌনতা ভিত্তিক অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কী সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের তাদের নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করার ওপর অনুমতি দেয়া যায়? উত্তরে বলব– আমি আপনাকে বলছি, পিতামাতা নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে এমন পরামর্শ দিতে পারে যে, কোথায় বা কাকে কার সাথে বিয়ে হবে তারা বিয়ে করবে কিন্তু তারা কোন বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। আপনি কী নিশ্চিত বলতে পারেন যে, পিতামাতার পছন্দ সবসময়ই সঠিক হবে? সুতরাং ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা বা পরামর্শ দিতে পারবে, কিন্তু তারা কোনরূপ বাধ্য করতে পারবে না, কারণ এটি নিশ্চিত যে, অবশেষে স্বামীর সাথে তার কন্যাকেই থাকতে হবে পিতা-মাতাকে নয়।

২৮. প্রশ্নঃ আমি মিসেস রাজিয়া খান, আমার প্রশ্ন, 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক- কিন্তু কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ইসলাম শুধুমাত্র পিতাকেই সন্তানের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে কথাটি ভুল। ইসলামী শরীয়া মতে, জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ মোটামুটি ৭ বছর বয়স পর্যন্ত অথবা ৭ বছরের কম বয়সের সময় সন্তানের অভিভাবকত্ব মায়ের হাতেই থাকে, কারণ এ সময়ে মায়েরা সন্তানদের প্রতি পিতার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল থাকেন। তারপর অভিভাবকত্ব পিতার উপর আসে সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তখন এটা তার স্বাধীন ইচ্ছা যে, সে কার কাছে থাকবে। সে পিতা মাতা যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাকে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সেবা-শুশ্রুষা ও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

নারীর ভূমিকা

মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শেখ আবদুল বারী আওয়াস আস-সুবাইতি জুম'আর খুতবায় মুসলমানদেরকে খোদভীতির উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ইসলাম নারীকে দুনিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে পাঠিয়েছেন সেটা হল মাতৃত্বের মিশন। আল্লাহ্ নারীকে এ মিশনের জন্য প্রস্তুত করে তাকে দয়া ও নারীত্ব, ধৈর্য ও আবেগ দান করেছেন।

নারী সন্তানের জন্য সকলের চেয়ে অধিক স্নেহশীলা। নারী বিদ্যালয়, তাকে তৈরি করলে সর্বোত্তম জাতি তৈরি করা হয়। নারী হল লালনস্থল; পিতা ও সন্তান যখন ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত ও অসুস্থ হয় তখন সে কষ্ট স্বীকার করে; নারী হচ্ছে শিক্ষিকা, চিকিৎসক ও বন্ধু, সে সন্তানের ব্যথা নিরাময়কারী ও আশার ভাণ্ডার। শিশু-সন্তানের কোন প্রয়োজনে তার মাতা ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী নেই, তার কোন ক্ষতি হলে মাতা ছাড়া তার দুঃখ দূর করার আর কেউ নেই। দুনিয়াতে মাতার স্থান অধিকার করার মত কেউ কি আছে? এমন কি পিতাও তা পারে না, বরং শত শত পুরুষ মাতার কোন কিছুর অভাব পূরণ করতে পারে না।

মাতার জন্য তাই মাতৃত্ব ব্যতীত অন্যান্য কাজ হচ্ছে প্রতারণার মত কারণ তা তার সন্তানদেরকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে এবং পারিবারিক আবরণ ভঙ্গে দেয়। যারা নারীকে ঘরের বাইরে নেয়ার দাবি জানায় এবং বলে যে, সে হল সমাজের অর্ধেক, তাদের একথা দ্বারা মাতৃত্বের মিশন সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা প্রতীয়মান হয়; তারা তাকে নিষ্কর্মা, অলস মনে করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে সংগ্রাম, ধৈর্য, পরীক্ষা, রাত জাগরণ, আত্মত্যাগ, শ্রম ও শান্ত্বনার প্রতীক।

নারী সম্পূর্ণ দিনে তার রাজত্বে তথা গৃহে সামান্যতম অবসর সময় পায় না; নির্দেশনা, শান্ত্বনা ও সূক্ষ্ম লালন পালনে সে সর্বক্ষণ সন্তানদের সাথে থাকে এবং স্বামীর সাথে আন্তরিকতা, ভালবাসা ও যত্ন উপভোগ করে। শিশুর লালন-পালনে মনোনিবেশকারী মহিলা গৃহের কর্তব্যসমূহ পালনকালে সামান্য সময় পায়। কোন শিশু অসুস্থ হয়, কন্যা কিছু চায়, ছেলের পড়া দেখিয়ে দেয়া। এভাবে দিন কেটে যায় বরং তার (মাতার) নিজের কাজের কিছু বাকী থেকে যায়।

লোকেরা বলে ঘরের চাকর এসব কাজ করে। এটা ভুল ধারণা; যে শিশু দাসীদের লালন-পালনে বড় হয় সে তাদের বৈশিষ্ট্য পায়, অভ্যাস অর্জন করে এবং তার আদর্শে প্রভাবিত হয়, অনেক বিষয়ে তার প্রভাব পড়ে। দাসদাসী কখনো প্রাকৃতিক মাতার স্থান কখন পূরণ করতে পারে না। শিশু কোথায় দয়া, মহানুভবতা ও স্নেহ পাবে? পুরুষ অনুপস্থিত থাকলেও মহিলা সঠিক পথে চললে সংসার সঠিক থাকে। নারীর শত্রুরা তাকে গৃহ ও পর্দা থেকে বাইরে আনার দাবি জানায় যাতে তার চরিত্র নষ্ট করে, মর্যাদা ধ্বংস করে এবং সে অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়। এটা ভ্রান্ত ও পতনশীল দাবি; নারীর শারীরিক গঠন কখনো পুরুষের শারীরিক গঠনের অনুরূপ নয়।

আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে তাদের প্রত্যেককে একে অপর থেকে ভিন্ন শক্তি ও সামর্থ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের গঠন তার উপর অর্পিত কাজের জন্য উপযোগী; এর দ্বারা তাদের জীবন পরিপূর্ণ হয়; সুতরাং একে অপর থেকে স্বনির্ভর নয় এবং একে অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারেনা, যদি চলতে চায় জীবনের স্পন্দন তখন থেমে যায়। যদি তাদের একজন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে অথবা অন্যের কাজ করতে

চেষ্টা করে তবে সমাজে অরাজকতা দেখা দেয়, বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং মানুষ অশান্তি ও সমস্যায় পতিত হয়।

নারীকে পুরুষের কাজ করতে বাধ্য করা হলে তা তাকে বিনষ্ট করে, তার বন্ধন ছিন্ন করে এবং সমাজকে ধ্বংস করে। তার এমন লোকের কাছে থাকা দরকার যে তার ব্যথা লাঘব করবে এবং তার দুঃখ-কষ্ট মুছে দিবে; সে যা না দেয় তার অভাব বোধ করবে। নারীর লালন-পালনের পেশা পুরুষের পেশার চেয়ে বেশি কোন অংশে কম নয় বরং অধিক গুরুত্ব ও দায়িত্বপূর্ণ; কারণ সে গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, বুকের দুধ পান করানো ও দেখাশুনার কাজসহ যাবতীয় কাজ করে এবং এতে পিতার চেয়ে মাতার সাথে সন্তানদের সংযুক্তি ও প্রভাব বেশি হয়। ফলে মাতার পক্ষে সন্তানদেরকে তার ইচ্ছা মত গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

বর্তমান যুগের নারী তার ঘর পরিত্যাগ করেছে এবং এর ফলে সভ্য সমাজ ঘরের পেশা ও মাতৃত্বের দায়িত্বকে হারিয়েছে; শিশু পালনের ভূমিকা ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় মাতার থেকে দূরে শিশুর লালন পালনের বিপদের ও অকল্যাণের বিষয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুগত লাভের আশায় নারীকে পুরুষের সাথে কাজে নামানো হল একটি মোহ, ভুল ধারণা ও বোকামী; কেননা নারী যদি তার ঘরে থাকে তবে তা তার সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও যোগাযোগের ব্যয় কমাতে সাহায্য করে। সন্তানরা যখন কাজ বা পড়ালেখা থেকে এসে দেখে যে মাতা তাদের অপেক্ষায় আছে তখন তাদের সে খুশী কী কেউ অনুভব করতে পারে? তাদেরকে দেখার আগ্রহে মাতার আবেগ পূর্ণ থাকে। নারী তার ঘরের কাজ করলে দাসীদের জন্য কষ্টকর প্রস্তুতকরণ থেকে সমাজ বাঁচতে পারে, কারণ এ ক্ষেত্রে মাতা তার শিশুকে প্রাকৃতিক দুধ পান করাবে এবং এতে সন্তান স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবা ও রোগ-ব্যাধি থেকে প্রতিরক্ষা লাভ করবে। এভাবে পরিবারে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত খরচ বেঁচে যায়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, শিশুর লালন-পালনে মনোনিবেশকারী মুসলমান মহিলা সমাজের জন্য উৎপাদনশীল নয়, সে জীবিত মানব সম্পদ হারানোর দাবি ও আহ্বান জানায়; যে সম্পদ লোকসানমূলক কারবারের ফলে কোন মূল্য আনতে পারে না, তার পেছন থেকে পুরুষরা স্বল্প মুনাফা ও অনুল্লেখযোগ্য বস্তু অর্জন করে।

পাশ্চাত্যে নারীরা তাদের নিজের ও তাদের অবস্থার ব্যাপারে প্রতারিত হয়ে বলে যে, তারা বাধ্য হয়ে কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বেরিয়ে গেছে, বস্তুবাদী সমাজের পুরুষরা তাকে প্রত্যাখ্যান ও উচ্চ মর্যাদা প্রদানে অস্বীকার করার পর বলপূর্বক অপছন্দনীয় কাজে বাধ্য করা হলেও সে তা স্বীকার করে না) কিন্তু ইসলামে তার পিতা, স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোনদের উপর ব্যয় ভার বহনের আদেশ দিয়ে নারীর মর্যাদা সংরক্ষিত রয়েছে।

পাশ্চাত্যে নারী নিজের ক্ষুধা নিবারণের উদ্দেশ্যে এক মুঠো খাবার সন্ধানে ঘর ছাড়ছে, কিন্তু ইসলাম পবিত্র আত্মা ও চিন্তা, বুদ্ধি ও অন্তর দ্বারা যুবক ও যুবতীদের প্রাকৃতিক বর্ধনের লালন ক্ষেত্রকে বুদ্ধিমান বানায়। যন্ত্র তৈরি করার জন্য নারীর বাইরে বের হওয়া, না অগ্রগতি তৈরি করা ও ঘরের বিদ্যালয়ে উন্নয়ন কোনটি আগে আসে? মানুষের যত্ন নেয়ার চেয়ে কী যন্ত্রের যত্ন নেয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম? মানব উন্নয়নের চেয়ে কী বস্তুর উন্নয়ন বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

আমরা আলেম, সংস্কারক ও শিক্ষকদেরকে তাদের কর্তব্য মনে করিয়ে দিই যে, তাদের কর্তব্য হল নারীকে এমন শিক্ষা দেয়া যাতে সে তার বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মে বিশ্বাসী ঈমানদার বংশধর জন্ম দেয় যারা তাদের অধিকার ও কর্তব্যাবলী সম্বন্ধে জানে। আল্লাহ বলেন -

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۔

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর" -সূরা তাহ্রীম ঃ ৬। মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমাদের সবাই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।"

নারীর অধিকার

মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতীব এবং সৌদী মজলিসে শূরার সদস্য ডঃ ছালেহ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হোমাইদ জুমা'আর খুতবায় মুসল্লিদের খোদাভীতির উপদেশ দিয়ে পরম শক্তিশালী আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন গুনাহ্ ধ্বংস ডেকে আনে।

ইসলামের বিধান নারীর প্রতি দয়ালু, নারীর অধিকার রক্ষাকারী মর্যাদা প্রদানকারী এবং তার নারীত্বের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে সর্বকালেই চালু থাকবে। এই বিধান মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনের তত্ত্বাবধায়ক। এ অধিকার হচ্ছে মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও শ্রমিকদের অধিকার এবং এ অধিকার হচ্ছে অনেক।

সত্য আলোচনার জন্য প্রয়োজন আলোচনাকারী বিনয়, সে প্রতিরক্ষার মাধ্যমে কথা বলবে না, নিজের বিষয়ে, অভিযোগের সুরে কথা বলবে না; অথবা এমন কথাও নয় যে, বিচ্যুতি ও কৃত অত্যাচার গ্রহণ করার জন্য জোর করা হয়– এরূপ হল জাহেলী যুগের রীতি। বরং এমনভাবে আলোচনা করতে হবে যেন সেটা সমসাময়িক বিষয় দর্শক ও শ্রোতা ইসলামের ইতিহাসে নারীদের মধ্যে একজন সম্মানিত মহিলার জীবন থেকে নারী অধিকার ও এর সঠিকতা দেখতে পারে; উক্ত মহিলা (হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা-রাঃ) মুসলমান মহিলার অধিকারের অধিকারী ছিলেন এবং তা উপভোগ করেছেন; সে জীবনী ছিল অন্যকে কথা বলার সময় বিশ্বাসী এবং লেখায় সত্য ইতিহাস; এই জীবনী ও চলার পথে ইসলামের এসব সত্যিকার, সজীব ও জীবনের অধিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন -

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۔

"স্ত্রীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে" -সূরা বাক্বারাঃ ২২৮।

অতীত বা বর্তমানকালে এই সুবিচারের মত অধিক সঠিক ও সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার কখনো আসেনি আসবেও না।

এসব অধিকারের উদ্দেশ্য তার প্রাপ্য এই যে, নারী অধিকার তাদের প্রাপ্য অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে দেয়া হবে। তার ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে কোন প্রকার অত্যাচার করা হবে না। যে কাজ তার জন্য উপযুক্ত, যা সে ভালভাবে করতে পারে ও যে কাজে নারী নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে তা তাকে দেয়া হবে। এটাই হল সত্যের ধর্ম ইসলাম এর নীতি এটা সুস্থ্য বুদ্ধির পথ প্রদর্শক। দুই লিঙ্গের কাজকে এক করার চিন্তা করা হবে না,

প্রত্যেকের প্রাপ্ত অধিকারে অন্যকে অংশীদার করা হবে না বরং পুরুষ ও মহিলার অধিকার ও প্রয়োজন ভিন্ন হওয়ায় তাদেরকে ভিন্ন দুই শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হবে।

এসব অধিকারের অন্তর্ভূক্তিকরণ ও দায়িত্বের সীমারেখার এ উদাহরণ মহানবীর (সা) ঘর থেকে নেয়া যায়, সে ঘর ছিল মহানবীর (সা) স্ত্রীগণের আদর্শ ও অনুকরণীয় ঘর, বিদ্যা ও আল্লাহর স্মরণের ঘর, কোরআন ও দর্শনের ঘর। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ـ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ـ

"(হে নবীর স্ত্রীগণ) তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য হবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ্ কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে চান। আল্লাহ্র বাণী ও জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের ঘরে তেলাওয়াত করা হয় তোমরা সর্বদা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ" -সূরা আহ্যাবঃ ৩৩-৩৪।

মহানবীর (সা) ঘরে ছিল বিনয়ভাব ও শান্তি। যদিও তাতে ছিল দারিদ্র ও স্বল্পতা, ছোট ছোট কামরা, খাবারের অধিকাংশ ছিল আটা, পানি ও খেজুর; অনেক সময় এক মাস কিংবা দুই মাস চলে যেত কিন্তু মহানবীর (সা) ঘরে চুলায় আগুন জ্বলত না। তিনি চাইলে সীমাহীন সম্পদের মালিক হতে পারতেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়া পছন্দ করেছেন; একদিন ক্ষুধার্ত থাকতেন, একদিন খাবার খেতেন। মহানবীর (সা) স্ত্রীগণ ছিলেন অল্পে সন্তুষ্টি ও লালসা দমনের উত্তম আদর্শ। তাঁরা আরাম ও ধৈর্যের মধ্যবর্তী পন্থা পছন্দ করেছেন এবং এভাবে সর্বোত্তম ভাগ্য বেছে নিয়েছেন; তাঁরা নবীদের পদ্ধতি ও মুমিনদের মাতাদের পথ অনুযায়ী ধৈর্যকে বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

"হে নবী, আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব বিলাসিতা চাও, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালের সুখ চাও, তবে তেমাদের জন্য আল্লাহ্ মহা পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন" -সূরা আহ্যাবঃ ২৮-২৯

কঠিন পরিস্থিতি, দ্রারিদ্র জীবন ও নবুয়তের সুমহান ও কঠিন দায়িত্বের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও মহানবীর (সা) স্ত্রীগণ সম্মানের বাসস্থান ও নবীর (সা) সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখার অংশীদার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন যিনি এ সুখী জীবন যাপনে অংশ গ্রহণ করেছেন। সঠিক পথ ও মহান স্ত্রীগণের মধ্যে কম সাজ-সজ্জা ও উচ্চাকাংখার ভালবাসা, দুঃখ, ছোট-খাট বিবাদ, অনুভূতি প্রকাশ ও নারীর উদ্দীপনার দিক দিয়ে সব বৈশিষ্ট্যে তিনি সবচেয়ে সুখী এবং মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি হচ্ছেন ঈমানদারদের মাতা, আল্লাহর প্রিয় বান্দা- রাসূল (সা) এর প্রিয় স্ত্রী, আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দোষ ঘোষিত, সত্যবাদী ছাহাবী হযরত আবু বকর (রা)-এর সত্যবাদী কন্যা হযরত আয়েশা (রা)। মহানবী (সা) নবুয়তের দশম বছর শওয়াল মাসে মক্কায় তাঁকে বিবাহ করেন এবং মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছর শাওয়াল মাসে তাকে নিয়ে সংসার শুরু করেন। তিনি ইহকাল ও পরকালে মহানবীর (সা) স্ত্রী। মহানবী (সা) হযরত আয়েশাকে (রা) বলেন, "আমি তোমাকে দু'বার স্বপ্নে

দেখেছি, মহিলাদের এক দলে তোমাকে দেখি, বলা হল ইনি আপনার স্ত্রী, অতঃপর তোমার আচ্ছাদন উন্মোচন করা হল এবং দেখি সে মহিলা তুমি। আমি বললাম, নিশ্চয় এটি (তুমি) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে (অনুগ্রহ হিসেবে এসেছে)।"

হযরত আয়েশা (রা) মহানবীর (সা) সাথে তাঁর বিবাহের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, "ছয় বছর বয়সে মহানবী (সা) আমাকে বিয়ে করেন। অতঃপর মদিনায় হিজরত করে হারিস ইবনুল খাযরাজের ঘরে উঠলাম। আমি এমনভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম যে, আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেল এবং অসুখের দরুণ তা অসহনীয় হয়ে উঠল। অতঃপর উম্মে রুমান আমার কাছে এল। তখন আমি সাথীদের সাথে ঘুরাফেরা করছিলাম। সে আমাকে ডাকলে আমি তার কাছে গেলাম এবং আমি জানতাম না কি করব। সে আমার হাত ধরে নিয়ে ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করাল এবং বেশি অস্থিরতা ও ব্যস্ততার দরুণ তখন আমি দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। অতঃপর আমার প্রাণ কিছুটা শান্ত হল এবং সে কিছু পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিয়ে আমাকে এক ঘরে প্রবেশ করাল। তখন আনসারের কতক মহিলা বলতে লাগল, 'তোমার মঙ্গল ও বরকত হোক এবং যাত্রা শুভ হোক।' সে আমাকে উক্ত মহিলাদের কাছে ছেড়ে গেল এবং তারা আমার সাথে সদ্ভাব দেখাল। সকালে মহানবী (সা) আমার যত্ন নিলেন এবং উম্মে রুমান আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করল। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।" -বোখারী ও মুসলিম

এই ক্ষুদ্র স্ত্রী তাঁর পিতামাতার ঘর থেকে স্বামীর ঘরে যাওয়ার একাকীত্ব অনুভব করেননি। তিনি স্বামীর দয়া ও পিতার স্নেহ উপভোগ করতেন এবং এর আগে ও পরে মহানবী (সা)-এর অনুগ্রহ পেতেন। মহানবীর (সা) ঘরে সুখের সংসার গড়ে উঠল। আয়েশা (রা) সেখানে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন এবং তাঁর পিতামাতার ঘরে যেভাবে তার বয়সী ছোট সাথীদের সাথে খেলা করতেন, মহানবী (সা) সেভাবে তাঁকে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী তার বয়সী মেয়েদের সাথে খেলতে দিতেন।

ধর্মে ও নবুয়তের মর্যাদা মানব প্রকৃতির বিরোধী নয়। কোন এক উৎসবে কিছু হাবশী (ইথিওপিয়ান) ঢাল ও বর্শা নিয়ে খেলা করছিল। রাসূল (সা) আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী খেলা দেখতে চাও?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর গালের উপর গাল রেখে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন, যখন আশেয়া (রা) ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার খেলা দেখা হয়েছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" রাসূল (সা) বললেন, "যাও এখন।" আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আনন্দ লোভী অল্প বয়স্ক মেয়েটির (আমার) জন্য আরও অব্যাহত শক্তি ও উৎসাহ যোগালেন।

হযরত আয়েশা (রা) ঘর দেখাশুনা করতেন ও স্বামীর কাজের অংশীদার ছিলেন। মহানবী (সা) তাঁকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন এবং পরিবারের সদ্যসদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। হযরত জাবের (রা) বলেন, মহানবী (সা) একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, কোন বস্তু পছন্দ করলে তার অনুসরণ করতেন। একদিন এক প্রতিবেশী তাঁকে নিমন্ত্রণ করল এবং সে সুস্বাদু খাবার তৈরি করতে পারত। সে রাসূল (সা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে নিয়ে এসে তাঁকে ডাকল। রাসূল (সা) বললেন, এবং "এর জন্য" অর্থাৎ আয়েশার (রা) জন্যও কী খাবার এনেছ? প্রতিবেশী বলল, না। রাসূল (সা) বললেন, 'না (আমি খাব না)। অতঃপর সে চলে গিয়ে আবার ফিরে এল। এবারও রাসূল (সা) বললেন, "আয়েশার জন্য এনেছ"? সে বলল, না। তিনি বললেন, 'না'। অতঃপর সে চলে

গিয়ে আবার এসে তাঁকে ডাকল। মহানবী (সা) বললেন এবং "তার জন্য"। তৃতীয়বার সে বলল, 'হ্যাঁ'। অতঃপর দু'জন দাঁড়িয়ে পরস্পর মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, "যখন তুমি আমার প্রতি অখুশি থাক তা আমি অবশ্যই বুঝতে পারি।" আয়েশা (রা) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তা কিভাবে বুঝতে পারেন?" তিনি বললেন, "যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, মোহাম্মাদের প্রভুর শপথ", আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, "ইবরাহীমের প্রভুর শপথ।" আমি বললাম, "এটা ঠিক, আমি শুধু আপনার নাম বাদ দেই।"

সাহাবীগণ রাসূল (সা)-এর নির্দেশনা পেতে তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করতেন (সপ্তাহে) একদিন, আয়েশার (রা) ভাগে রাসূল (সা)-এর কাছে দু'দিন নির্দিষ্ট ছিল– একদিন নিজের এবং একদিন হযরত সওদা (রা)- এর। আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত একদিন রাসূল (সা) আমাকে বললেন, "হে আয়েশা জিবরাইল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন"। আমি বললাম, "আপনার উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমি যা দেখি না আপনি তা দেখেন।" আমর ইবনুল আ'ছ (রা) একদিন রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল লোকদের মাঝে আপনার সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন, "আয়েশা"। আমর বললেন, পুরুষদের মাঝে সবচেয়ে প্রিয় কে? তিনি বললেন, "তাঁর (আয়েশার) পিতা"। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, "ওমর"। রাসূল (সা) আয়েশা (রা) ছাড়া পূর্বে অন্য কোন অবিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে করেননি এবং আয়েশা (রাঃ) ছাড়া তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে ওহী আসেনি। রাসূল (সা) তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও নিপুণতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) মুসলমান উম্মাহর জন্য বরকতস্বরূপ। আল্লাহ্‌ যখন কারণ সহকারে এতিম সম্বন্ধে ওহী নাযিল করলেন তখন ওসাইদ ইবনে হোদাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিবারের সদস্যগণ, এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়; যখনই তিনি (আয়েশা) কোন বিষয়ে অশান্তি (চিন্তা) মনে করতেন তখনই সেটাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা মুসলিম উম্মাহর জন্য বরকতের বিষয় করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সময়ের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা এবং দান ও দক্ষিণায় সবার অগ্রণী ছিলেন।

তিনি দুর্বল ও ভগ্নহৃদয় লোকদের অন্তর জুড়ে ছিলেন। একবার তাঁর বোনের ছেলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে জুবাইর তাঁর কাছে এক লাখ দিরহাম সম্বলিত দু'টি থলে পাঠালেন; তখন আয়েশা (রা) রোজা রেখেছিলেন। তিনি খাবার কিনে এনে লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তখন আবদুল্লাহ্‌ বললেন, হে উম্মুল মোমেনীন! আপনি যা খরচ করেছেন তার থেকে কী ইফতারের জন্য এক দিরহাম দিয়ে গোশত আনতে পারতেন না? তিনি বললেন, "আমাকে অধৈর্য করো না, তুমি স্মরণ করালে আমি তা করতে পারতাম।" বোখারী শরীফে এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখনই কোন সম্পদ (রিযিক) তার কাছে আসত আয়েশা (রা) তার কিছুই না রেখে সবই দান করে দিতেন।

বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তিনি পরিপূর্ণ ছিলেন; তিনি দ্রুত বুঝা, স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান অর্জনে বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি রাসূল (সা) এর হাদীস এত বর্ণনা করেছেন যে, হাদীস, ইতিহাস ও সাহিত্যের সব পুস্তক তা সংকুলান করতে পারেনি। তিনি ছিলেন বিদ্যা ও নির্দেশনার অফুরন্ত ভাণ্ডার, মানুষ তাঁর বর্ণনা থেকে হাদীস মুখস্থ করেছে। মহান আল্লাহ্‌ তাঁকে ধর্মের নিয়মাবলী, নীতিসমূহ এবং মহানবীর (সা) কথা, কাজ, বর্ণনা, ইবাদত ও অভ্যাস সম্পর্কিত

সুন্নতের মূল অর্থে বিজ্ঞ বানিয়েছেন। তিনি সাহাবীদের মধ্যে বিশ্বস্ত সূত্র ছিলেন। আবু মুসা আশয়ারি (রা) বলেন, যখনই কোন বিষয়ে আমাদের মাঝে সমস্যা দেখা দিত তখন সে ব্যাপারে আয়েশাকে (রা) প্রশ্ন করা হত এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা পেতাম। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী এবং উত্তম বিচারের অধিকারিণী। শিক্ষাবিদ যুহরি বলেন, মহানবীর (সা) সব স্ত্রীর বিদ্যা যদি একত্রিত করা হয় তবুও আয়েশার (রা) বিদ্যা অধিক হবে। হাকিম তার কিতাবে বলেন, শরীয়তের বিধানাবলীর এক-চতুর্থাংশ আয়েশা (রা) এর কাছ হতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সা)-এর হাদীস ও বর্ণনা থেকে তিনি যা মুখস্থ করেছেন তার জন্য তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত সূত্র। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি এবং সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে উচ্চতম স্থানে ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) হলেন বিদ্যা, গুণ ও উত্তম স্ত্রীর ক্ষেত্রে মুসলমান নারীর জন্য অনুপম আদর্শ। এগুলোই হল অধিকার ও দায়িত্ব। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا، وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

আর আকাংখা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ্ তোমাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার জন্য এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার জন্য। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত" -সূরা নিসাঃ ৩২।

ইসলামের বিধান নারীর প্রতি বিবেচনামূলক, তার অধিকার সংরক্ষণকারী, তার মর্যাদার প্রহরী এবং তার নারীত্বের রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে অতীতেও ছিল এবং এখনও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। হযরত আয়েশার (রা) মত মহিলা হচ্ছেন মানবতার ধর্ম পালনকারী এবং অধিকার ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন। এর দ্বারা পুরুষের চরিত্রের তুলনা পরিমাপ করা হয়। মহানবী (সা) বলেন, "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারে কাছে উত্তম"। তিনি আরও বলেন, "নারীদের মধ্যে একমাত্র সে সম্মানের যোগ্য যে উদার ও দয়ালু"।

পারিবারিক সৌহার্দ

মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব শেখ হোসেন আবদুল আজিজ আশ-শেখ জুমা'র নামাযের সময় প্রদেয় খুতবায় মুসলমানদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন, ইসলামে নরীদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল কঠিন সময়ে তার স্বামীর উত্তম সাহায্যকারিণী এবং সন্তুষ্টির উত্তম মরুদ্যানে পরিণত হওয়া, যাতে স্বামীর জীবনের দুঃখ-কষ্ট অবসান হয় তার কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগতি এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে যা তাকে সব কল্যাণমূলক কাজে লিপ্ত হতে সক্রিয় ও উৎসাহিত করে। আপনারা আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং বিভক্ত না হয়ে আল্লাহর রশিকে (ধর্মকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। মুসলমানদের দল এবং তাদের সরল নির্দেশনা ও স্পষ্ট পথে স্থির থাকুন যে পথে সাহাবীগণ ও তাবেয়িগণ চলেছেন।

ইসলামে বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য হল স্বামী-স্ত্রীর নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, স্বস্তি এবং শান্তি নিশ্চিত করা। বিবাহিত দম্পতি জীবনযাপন ও জীবনের বিরাট দায়িত্ব পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং সুখে-দুঃখে এমনভাবে জীবন কাটাবে যে, জীবনে স্নেহ-মমতা মুগ্ধ করবে, শান্তি উদারতা, সৎ কাজ, ক্ষমা ও সদয় ব্যবহার জীবনকে আচ্ছাদিত করবে। আল্লাহ্ বলেন -

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

"আর তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে পরম শান্তি অনুভব কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন" -সূরা রুম ঃ ২১। এই স্নেহ ও দয়া করার মজবুত ভিত্তির উপর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দীর্ঘদিন টিকে থাকে। এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নির্দেশাবলী ও আচরণসমূহ ইসলামের বিধানে এসেছে, আরও এসেছে জীবন পদ্ধতির পরিকল্পনা কিভাবে দাম্পত্য জীবন সুখী হয় এবং স্বাধীনতা, ঐক্যমত, সম্প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা বিরাজ করে; এটা একটা সরল পদ্ধতি যা দর্শন, মঙ্গল ও সংস্কারে পরিপূর্ণ, এটি এমনই পদ্ধতি যা সমস্ত বৈবাহিক জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

ঐ সব ভিত্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে দেয়া। এইসব সীমা ও মৌলিক বিধান হল একজন নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তা পছন্দ করবে এবং নিজের অপছন্দ তা অন্যের জন্য অপছন্দ করবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

"পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনি পুরুষদের উপর অধিকার রয়েছে স্ত্রীগণেরও, -সূরা বাক্বারা ঃ ২২৮। ইসলামে বিবাহের জন্য কিছু অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে, স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য হল এসব পালন ও পূর্ণভাবে মূল্য দেয়া। তার মধ্যে প্রধান কর্তব্য হল ভাল কাজে আনুগত্য ও গুনাহ্‌বিহীন কাজের আদেশ পালন।

এতে স্ত্রী সংসারে তার আকাংখিত সুখ ও কল্যাণ পেতে পারে। রাসূল (সা) বলেছেন, "স্ত্রী যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমজান মাসে রোজা রাখে, নিজ লজ্জাস্থল হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তবে তাকে বলা হবে, বেহেশতের যে দরজায় তোমার ইচ্ছা সেখান দিয়ে তুমি প্রবেশ কর।"

কোন্ মহিলা উত্তম, এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, "যে স্ত্রীর দিকে তাকালে তার স্বামী মুগ্ধ হয়, যে স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করে এবং নিজের ও তার মালের ব্যাপারে স্বামী যা অপছন্দ করে তার বিরোধিতা না করে।" এসব অমান্য করা বিপজ্জনক ও মন্দ কাজ। মহানবী (সা) বলেছেন, "স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে না আসে এবং রাতে তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীকে লানত দেয়।" তিনি আরও বলেন, "স্ত্রী যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে না যায়, যদি সে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত অথবা তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে লানত দেয়।"

ইসলামে স্বামীর আনুগত্যের যে বিধান রয়েছে তার অর্থ অন্ধ অনুসরণ নয়। যদি সে বুঝে যে, স্বামী অধিকার নিয়ে স্বৈরাচারি না করে। এটা তার (স্ত্রীর) ব্যক্তিত্ব নষ্ট করা বা তার মর্যাদাহানী করা নয়। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, বৈবাহিক জীবন লড়াই, একগুঁয়েমি ও কঠিন মতামতের ক্ষেত্রে পরিণত করা। ইসলামের বিধান করা হয়েছে এজন্য যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে, স্বামী তার মনকে প্রশস্ত করবে এবং বৈবাহিক জীবনের সরল পথ ও আদর্শের ক্ষতি না করে এরূপ ব্যাপারে স্ত্রীর মতকে সম্মান করবে। স্ত্রী আনুগত্যের সাথে সাথে তার মতামত দিবে এবং সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্বামীর সাথে পরামর্শ করবে ও সিদ্ধান্তে অংশ নেবে।

তবে উভয়েই একে অন্যের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দেখাবে এবং যৌথভাবে দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ততা দেখাবে। পুরুষের কর্তৃত্বের চাহিদা অনুযায়ী এখানে আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্বশীল" -সূরানিসা ঃ ৩৪। আল্লাহ্ পুরুষদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এটা হচ্ছে তার দাবি অনুযায়ী আনুগত্য। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন- وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - "তাদের (নারীদের) উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে" -বাক্বারাঃ ২২৮। এটা শক্তি প্রয়োগের শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং এ হচ্ছে বিবাহ ও তার ঐক্যমতের ভিত্তিতে সাংসারিক নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ্ বলেনঃ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا- "তারা (স্ত্রীগণ) যদি তাতে তোমাদের বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না"-সূরা নিসাঃ ৩৪। এটা হচ্ছে যেহেতু স্বামীকে সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হয় এবং স্বামীর কাঁধে সে দায়িত্ব পালনের ভার দেয়া হয়েছে, সে যে (স্ত্রীর) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং স্ত্রীর কাজের দায়িত্বের চেয়ে বেশি দায়িত্ব লাভ করেছে, তার শ্রেষ্ঠত্ব।

মাতার মর্যাদা ও দায়িত্ব

মক্কা শরীফের মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতীব ডঃ সউদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শোরাইম মুসলমানদেরকে তার খুতবায় খোদাভীতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বেহেশতের সন্নিকটে যাওয়া যায় এমন কাজ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, ইসলাম মাতাকে পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। প্রত্যেক সন্তানের উচিত আল্লাহ্কে ভয় করা এবং তাদের মাতাদের সম্মান করা ও তাদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হওয়া। তিনি মাতাদেরকে তাদের প্রিয় সন্তানদের ভাগ্যের প্রতি অবহেলা ও তাদেরকে গৃহ পরিচালিকাদের কাছে ছেড়ে দেয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করেছেন।

মা দিবস পালন (Mother's Day), জন্মোৎসব এবং অনুরূপ অন্যান্য উৎসব (বেদাআত); ইসলামের শিক্ষাবিদগণ এগুলোকে নিষেধ করেছেন।

এ পৃথিবীতে মা এমন এক দুর্বল ও দুর্লভ সৃষ্টি, যার উপর সহানুভূতিশীল অনুভূতি ও দয়া প্রভাব বিস্তার করে, তার প্রচেষ্টা ও সদগুণ আছে এবং সে মহৎ কাজ সম্পন্ন করে। যে সব গুনাহ্কে প্ররোচক অনেক সময় অবহেলা করে তার থেকে সে নিরাপদ; তার স্নেহের শক্তি ও বিনয়ের প্রতিভা আছে; সূক্ষ্ম ও মহান অনুভূতিতে সে পূর্ণ; সন্তান তার শরীরের এক অংগের স্থান দখল করে এবং পরে তার অধিকারী হয়ে যায়। সন্তান যখন প্রশংসনীয় হয় তখনই শুধু সহজে তার চোখে আনন্দ আসে। তার দ্বারা চোখ খুশী হয়, তার পেট সন্তানের ধারণকারী, তার দুই স্তন সন্তানের তৃষ্ণা মিটায় এবং তার কোল তার জন্য হাওয়া (মানুষের মাতা)। সে তার মধ্যে পূর্ণ ও পরিপক্ক দয়া ও স্নেহের অধিকার রাখে।

মানুষ হিসাবে আল্লাহ্র দুর্বলতম সৃষ্টি হচ্ছে মা। কেউ কী জানে মা কী? মা হচ্ছে মানুষের মূল ও উৎস যার উপর সে নিশ্চিন্ত নির্ভর করে এবং যার কাছে সে ফিরে আসে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন -

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً -

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীগণ থেকে তোমাদের

জন্য সন্তান ও বংশধর সৃষ্টি করেছেন"। -সূরা নাহলঃ ৭২। কোন বস্তুর মূল ও উৎস হল অবস্থানের মর্যাদা, স্থানের উচ্চতা ও সূত্রের শক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ। আপনারা কী দেখেন না যে, সকল কিছুর মূল মানুষের মা হচ্ছেন হাওয়া, কোরআনের মা সূরা ফাতেহা এবং সমস্ত জনপদের মা হচ্ছে মক্কা।

মা সম্বন্ধে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কারো মনে এর উপকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানুষ থেকে নতুন কিছু নয় এমন সৃষ্টির আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় কী সমস্যা দেখা দিয়েছে? হ্যাঁ, আমরা যখন মা সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন এই বিবেচনা করে বলি যে, সে পিতার সংগিনী, সমাজে তার অধিকার আছে, সমাজ ঘরের সমষ্টি। ঘর তৈরী হয় পরিবার দ্বারা এবং পরিবার গঠিত হয় ঘর, তার প্রধান ও পরিবারের সন্তানদের দ্বারা।

মা হচ্ছে মানব জাতির উৎস; এভাবে সে যেন পূর্ণ জাতি, বরং সে সম্পুর্ণ জাতির জন্ম দেয়। ইসলাম মা-এর অধিকার এর গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাকে সম্মানের আসন দিয়েছে; লালন-পালন ও দুধ পান করানোর ব্যাপারে তার মর্যাদা আছে; এবং খরচ, আনুগত্য ও উত্তরাধিকার প্রশ্নেও তার মর্যাদা বিদ্যমান।

যে এরূপ প্রশ্নে নিজেকে নিয়োজিত করে, তার জন্য প্রয়োজন হল তার চিন্তাকে এ বিষয়ে নিয়োগ করা, তাহলে সে তার ব্যাপারকে সরল সঠিক করাতে আনন্দ পাবে এবং বিচ্যুতিতে নিরাশ হবে এবং পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করার জন্য মনোযোগী হবে। ফলে সে নিরাশবাদী ও আশাহীন বেপরোয়া লোকদের পেছনে ছুটবে না, কেননা এতে কে বোকা অথবা পাগল সে সম্বন্ধে চিন্তা করা হবে।

কখনো কখনো সন্তানরা মাতাদের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায় এবং মূল ও ভিত্তিকে ছিন্ন করে। রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বলে দিয়েছেন। সে রাসূল (সা)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল আমার উপর সবচেয়ে বেশী হকের অধিকারী কে? তিনি বললেন, "তোমার মাতা।" সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, "তোমার মাতা।" সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন "তোমার মাতা।" সে আবার বলল তারপর কে? চতুর্থবার রাসূল (সা) বললেন, "তোমার পিতা।" কোরআনের বর্ণনায় হযরত ঈসা (আঃ) বলেন,

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔

"এবং (আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন) আমার মাতার আনুগত্য করার; এবং তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি" -মরিয়মঃ ৩২।

মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসারে মানুষের মাঝে মাতার স্থান মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহ্ তার যে স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে এদিক সেদিক করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন অপপ্রচেষ্টা চলছে, সে তার কারণ জানুক বা না জানুক। এতে নিঃসন্দেহে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দিচ্ছে, মানব বংশ নষ্ট হয়েছে এবং বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। পুরুষগণ তাদের কাঁধ থেকে সন্তান ও তার যত্ন নেয়ার দায়িত্ব নিজের উপর থেকে পরিত্যাগ করে এবং সন্তানের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের চিন্তা করে।

কোন কোন সময় নিজের মধ্যে সমাজের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন আসে। মাতার নিজের দায়িত্বে অবহেলা। কত মাতা নিজেকে হীন অবস্থায় নিয়ে যায় অথবা তার জ্ঞান থেকে তার অবস্থান ও কর্তৃত্ব চলে যায়। যদি সে মহানবীর (সা) উপদেশের প্রতি একটু দৃষ্টি দিত তাহলে সে তাঁর এ বাণীটি দেখতঃ "স্ত্রী হচ্ছে তার স্বামীর পরিবারের সদস্যবর্গ ও তার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ কারী ও যত্ন গ্রহণকারিণী।" এটা জানা কথা যে,

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার উপরই দেয়া যায় যে রক্ষিতের উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ ক্ষমতা দ্বারা যতটুকু প্রতিহত করেন, কোরআন দ্বারা ততটুকু প্রতিহত করেন না।

মাতার দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আয়ের চিন্তা সন্তানদের শিক্ষা সঠিক পথে পরিচালনায় তার ভূমিকা দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে প্রতিরোধের স্রোতে প্রকৃতির নিয়ম বিস্ফোরিত হয়েছে এতে বহু মাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে; সন্তান জন্মদানের পর তাদের ধার্মিকতা ও আল্লাহ্র নৈকট্য কমে গেছে। এর ফলে অবহেলা এসেছে ও অনেক পরিবার ভেঙ্গে গেছে। কোন কোন সময় সে তার প্রিয়, সন্তানের ভাগ্যকে অমুসলিম পরিচারিকার হাতে ছেড়ে দেয়, যদিও পরিচারিকা মুসলমান হয় তবুও সে মাতার স্থান দখল করতে পারে না। এটা জানা ও নিশ্চিত কথা যে, এ অবস্থায় সন্তানের নিরাপত্তা নেই। অনেক মাতা বিজাতীদের ফ্যাশনের অনুসরণ করে; তাদের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়। এমন কী দেখা যায় তাদের কেউ কেউ বয়স ভুলে যৌবন লাভের প্রচেষ্টায় রত হয়। কাফেররা এসব ফ্যাশন শেষ করলেও মুসলমান মাতারা তা শুরু করতে থাকে। এ অবস্থায় মাতা দুঃখ ও অপমানের জীবন যাপন করে; সন্তানে তার কোন আশা থাকে না। কোন কোন সময় পোষা কুকুর বা বিড়াল স্থান দখল করে। অথচ তার সন্তানেরা অজ্ঞতা ও অসাবধানতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তারা তার ভাল মৃত্যুর অধৈর্য অপেক্ষায় থাকে যাতে তার ফেলে যাওয়া সম্পদ ও সম্পত্তি তারা ভোগ করতে পারে। আর যদি মাতা দরিদ্র হয়, তবে তার অবস্থা হল পঙ্গু ও বয়স্ক লোকদের যত্ন নেয়ার মত, তার জন্য এবং অনুরূপ লোকের জন্য সে ব্যবস্থা প্রশস্ত।

যারা মাতার গৃহ রক্ষণাবেক্ষণকে খারাপ মনে করে তারা জাতির বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতে মাতার গভীর প্রভাব সম্বন্ধে সাংঘাতিক অজ্ঞ; বরং পুরুষদেরকে ঘরের বাইরের দায়িত্ব দিলেও কঠিনতা ও অবস্থানের দিক দিয়ে বোঝা কমে না। কোন কোন মাতার মধ্যে যে বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায় তাতে সে সংসার থেকে মুক্ত হতে পারে না, এ পেশা শুধু তাদেরই উপযোগী এবং তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন -

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ۔

"এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই" (রুমঃ ৩০)।

ঐ মাতারা পরিপূর্ণ নয় যারা পরিবারের চিন্তা বাদ দিয়ে বিভিন্ন রকম বিজ্ঞান এবং তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষায় রত থাকে। এসব মাতা যে সমস্যাবলী শিখেছে তার চিন্তা করে এবং আরও অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে। তারা ঐরূপ পূর্ণ মাতার মত নয়; যে তার সম্মান রক্ষা করে এবং তার অন্তরকে ঈমান, আনুগত্য এবং কোরআন ও হাদীসের আলোতে আলোকিত করে এবং স্বামী ও সন্তানদের জন্য অনুপ্রেরণা স্বরূপ এবং দুঃখ লাঘবে শক্তি স্বরূপ। যা কেবল চরিত্র ও ধর্ম দিয়েই পিতা থেকে বড় হতে পারে; এর দ্বারা সে তার স্বামী ও সন্তানকেও বড় বানাতে পারে। নারী কখনো স্ত্রী, স্নেহশীলা মাতা অথবা বৃন্ত থেকে বৃদ্ধির পর মহৎ রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়। অনেকে মাতাকে মনে করে ঘরে বসা মানুষ, যার কাজ নেই। তাকে এমন স্থান মনে করা হয় যেখানে তৈরী খাবার ও সেবার পথ থাকে না (খাবার তৈরি ও সেবা করাকেই মাতার কাজ মনে করা হয়); এটা কাফেরদের পরিচিত এক প্রকার বিকৃত আচরণ যারা চারিত্রিক ও পারিবারিক দৈন্যতায় ভোগে।

এ কথা স্পষ্ট যে, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও সভ্যতা বহির্ভূত মাতার চেয়ে কর্মহীন মাতা উত্তম। যারা অন্যের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করে, হাত স্পর্শ করে ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয় তাদের চেয়ে শয্যাকক্ষে ও ঘরের রক্ষণকারিণী মাতা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। আমরা কঠিন সময়ে মর্যাদা সম্পন্ন লোকের মধ্যে ভারসাম্য রাখার বেশি গুরুত্ব দেই না, বরং আমরা চাই ইসলামের চাহিদা অনুযায়ী সরল সঠিক পরিবার প্রতিষ্ঠা–

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ -

"যারা বিশ্বাসী এবং যাদের সন্তানরা বিশ্বাসীও, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী" -তূরঃ ২১।

এ জাতির অগণিত মাতা সন্তানের পরিপূর্ণ লালন পালনের পাশাপাশি তাদের শিক্ষা ও সঠিক পথে পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও সুশিক্ষা তাদের লক্ষ্য ছিল; পরিবারের সংশোধনের ব্যাপারে তার স্বামীর সাথে মতবিরোধ করেনি এবং সব কাজের উর্ধ্বে ছিল মুসলমান পরিবারের সংশোধন।

হে মুসলমান মাতা-পিতা, পূর্ববর্তী লোকদের জীবনীতে শিক্ষা ও তাদের নেক অবস্থানে মঙ্গল রয়েছে। হযরত খানসা (রা)-এর জীবনী স্মরণীয়; শোকমূলক কবিতা আবৃত্তিতে তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং এতে অন্ধকার যুগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর তাঁর অন্তরে ঈমানের ছোঁয়া লাগল এবং তিনি মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন। মুসলমান পরিবারকে উচ্চ রাখা ও আল্লাহ্‌র কাছে তার উচ্চ মর্যাদা, আত্মত্যাগ ও প্রচেষ্টায় মাতার ভূমিকা সম্বন্ধে অবগত হলেন। তিনি তার চার পুত্রকে কাদেসিয়ার যুদ্ধে গমনকালে উপদেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ, নিজ পছন্দে হিজরত করেছ, তোমরা এক পিতা ও এক মাতার সন্তান, তোমাদের পিতা কখনো মন্দ কাজ করেনি এবং তোমাদের কথায়ও পাপ প্রকাশ পায়নি।" যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত চারজনই শহীদ হল। এ খবর তাদের মাতার কাছে পৌঁছলে তিনি শুধু বললেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাদের শহিদী মৃত্যু দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন; আমার প্রতিপালকের কাছে আমি আশা করি তাঁর রহমতে তিনি তাদের সাথে পরকালে আমাকে একত্রিত করবেন।"

হে মুসলমানগণ, এই হচ্ছেন খানসা, তাঁর অগ্রণী মাতৃত্বের গুণের স্বল্পতা কোথায়? তাঁর মধ্যে মাতৃত্বের কর্তব্যে অবহেলা কোথায়? বর্তমান মহিলাদের অনেকেই এরূপ দৃষ্টান্ত বুঝতে জ্ঞানের বিবেচনায় সংকীর্ণ ও মর্যাদায় নিচু। হয়ত কেউ কেউ চার সন্তানের মাতা হতে অপছন্দ করে এবং যদিও কোন দিন তারা সন্তানদের ব্যাপারে মনোযাগী নয় তাদের পালন ও শিক্ষা ভাল হয় না; তারা জানে না তারা কী আশা করে এবং এরূপ মাতা নিজের ও জাতির কল্যাণ করতে পারে না। গুনাহ্‌র জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যাদের উপর ভরসা করা হয় তারা বিপথে যায়। খানসার (রা) দৃষ্টান্তে সঠিক রূপে মাতৃত্বের চিত্র ফুটে উঠে। এটা শুধু অন্ধকার ও ইসলামের যুগে তাঁর জীবন যাপনের পার্থক্যের জন্য উল্লেখ করা হল; এখানে নারীর মাহাত্ম্য ও নারীত্ব পুরুষ থেকে কম শক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক পুরুষের উপর তাঁর উচ্চ স্থান প্রকাশ পায়। উম্মে সলিম (রা), আয়েশা (রা), উম্মে সালমা (রা) ও খানসার (রা) মত মাতারা বর্তমান যুগের অনেক পুরুষের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। উদাহরণে বলা হয়, বনের স্ত্রী সিংহ খামারে মোরগের চেয়ে উত্তম ও অধিক শক্তিশালী।

গুনাহে লিপ্ত হওয়ায় ও মন্দ পরিণতির দরুণ মাতার অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। আমাদের সবার জানা উচিত মাতা হচ্ছে উত্তম স্নেহশীলা ও দয়ালু ব্যক্তিত্ব; দুর্ব্যবহার ও শক্ত কথা সহ্য করে এবং ক্ষমা ও মুক্তি চাওয়ার আগেই আবার ক্ষমা করে দেয়। সন্তানকে নয় মাস পেটে ধারণ করে সন্তান জন্ম দেয়, সন্তানের বৃদ্ধির সাথে সাথে সে দুর্বল হয়; অসহনীয় ব্যাথা ও কষ্ট ভোগ করে। তার শরীর দুর্বল ও শক্তি কম; বমির তিক্ততা ও ক্ষুধা মন্দাসহ যাবতীয় যন্ত্রনায় ভোগে। এরপর আসে মানসিক ও শারীরিক প্রভাব; প্রসবের পূর্বে অত্যন্ত কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতিতে সন্তানের মঙ্গলের জন্য সে সব কিছু করে, এত কষ্টের পরও ভ্রূণের নড়াচড়ায় সে খুশী হয় ও নিরবতায় চিন্তিত হয়। অতঃপর প্রসবের সময় হয় এবং সন্তান জন্মের যে কষ্ট তা ভোগ করে, এমন কি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছায় এবং মরিয়মের এই কথার মত বলার ইচ্ছা হয়,

يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا -

"হায়, এর আগে যদি আমি মরে যেতাম এবং লোকে আমাকে একেবারে ভুলে যেত" -মরিয়মঃ ২৩। অনেক সময় ভ্রূন (সন্তান) অস্ত্রোপচার ও বল প্রয়োগ ছাড়া বেরিয়ে আসে না; ফলে মাতার অপারেশন হয় ও পেট কাটতে হয়। কিন্তু পরে সন্তানের মুখ দেখে সে সব ব্যাথা ভুলে যায় এবং মনে হয় কিছুই হয়নি। অতঃপর সন্তানের উপর আশা করে এবং তাতে জীবনের আনন্দ ও খুশী দেখতে পায়। আল্লাহ্‌র এই বাণী তখন বুঝা যায়ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য" -সূরা কাহ্‌ফঃ ৪৬।

এরপর সে দিনরাত সন্তানের সেবায় নিযুক্ত হয়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর নষ্ট করে খাওয়ায় ও নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সন্তান লালন পালন করে সন্তানের চিন্তায় নিজের খাবার, ঘুম ও আরাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাকে দুধ পান করানো ও ছুটানো এবং শিক্ষাদানের কষ্ট ভোগ করে এবং তার হাসি মুখ দেখে সে প্রসবের ব্যাথার কথা ভুলে যায়।

সন্তানদের উচিত মাতার অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা তাদের অনুগত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি ও বিপদ আসার আগে মাতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা; মাতার আনুগত্য হচ্ছে বেহেশতে যাবার পথ (উপায়) কেননা হাদীসে এসেছে "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত"।